অক্টোবর ২০২৫ ■ আশ্বিন-কার্তিক ১৪৩২

নবারুণ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

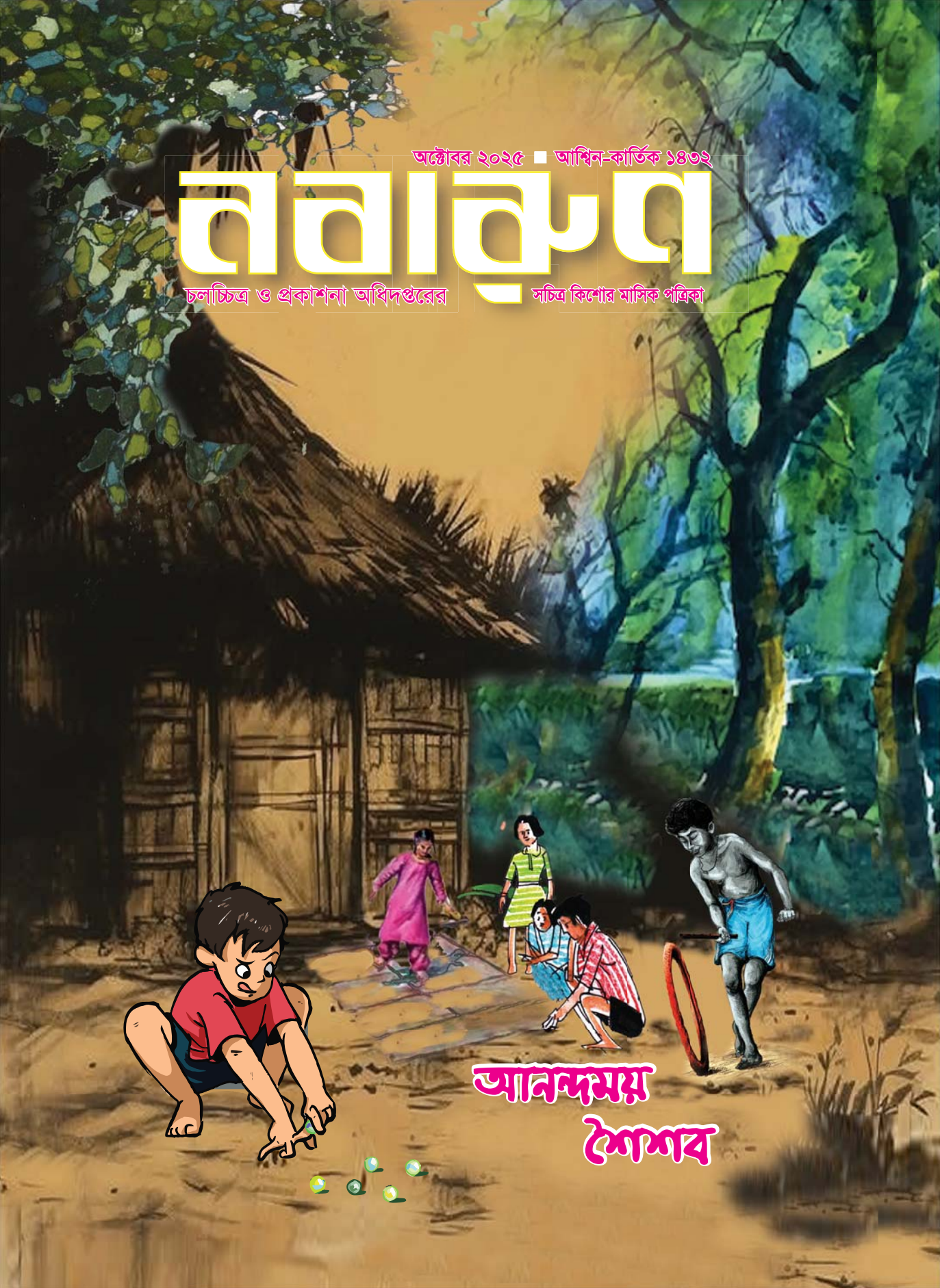

আনন্দময় শৈশব



ইউসুফ হায়দার আদিব, দ্বাদশ শ্রেণি, উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা



সাফিয়া নূর ঈদি, চতুর্থ শ্রেণি, চারুপাঠ হাতেখড়ি স্কুল, রূপনগর আবাসিক এলাকা, মিরপুর, ঢাকা

সম্পাদকীয়

শৈশবের স্মৃতিগুলোর প্রভাব মানবজীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শৈশবে মানবজীবনের ভিত্তি রচিত হয়। এ সময়ের মধুর স্মৃতি মানুষকে বাকিটা জীবনে তাড়িত করে, মানসিক শক্তি যোগায়। শৈশব হলো জীবনের সবচেয়ে মধুর সময়। এসময় দাদা-দাদি, নানা-নানি, মামা-খালা, চাচা-ফুফু, ভাই-বোন ও বন্ধুবান্ধবদের সাথে সম্পর্ক তৈরি হয়। ফুল, পাখি, প্রজাপতি, নদী, পানি ও প্রকৃতির নানা উপসঙ্গ শৈশবে মুগ্ধতা ছড়ায়।

এসময়টা কাটে ভাবনাহীনভাবে দুষ্টুমি আর খেলাধুলা করে। কিছু দশক আগেও শহরে বসবাসরত শিশুদের অন্যতম আনন্দের বিষয় ছিল বিভিন্ন ছুটিতে দাদাবাড়ি, নানাবাড়ি বেড়াতে যাওয়া, যেটি বর্তমান সময়ের শিশুদের জন্যও একইরকম আনন্দদায়ক। গাছে ওঠা, মাছ ধরা, পাখির বাসায় হানা দেওয়া, নানারকম দেশীয় ফল এবং পিঠা খাওয়া শৈশবের স্মৃতিতে জমে থাকা অনন্য সম্পদ হয়ে থাকে মানুষের মনে। এখন শিশুরা এর বাইরে বাবা-মায়ের সামর্থ্য অনুযায়ী দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করে। যেটা শৈশবকে সমৃদ্ধ করে।

তবে বর্তমানে একটি শিশুর শৈশব মানেই পড়াশোনার অনেক চাপ। অন্যদিকে বিভিন্ন ধরনের গেজেট ব্যবহারের দক্ষতাও তারা এ সময়েই অর্জন করে ফেলে। মাঠে গিয়ে খেলাধুলা করার বা সবুজ প্রকৃতির সান্নিধ্যে আসার সুযোগ শিশুরা আজকাল পায় না বললেই চলে। তাদের সামাজিকীকরণের দক্ষতা বৃদ্ধিতে পরিবার, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবদের ভূমিকা অনেক বেশি।

তাছাড়া বিভিন্ন ধরনের গেজেটের ব্যবহারও পরিমিত হওয়া প্রয়োজন। যাতে করে শিশুরা অনেক বেশি দক্ষ এবং একইসাথে মানবিক গুণসম্পন্ন হতে পারে। মূলত শৈশবের দুরন্তপনা, আড্ডা, ভাবনাহীন সময়ের স্মৃতি, প্রিয়জনের আদর, স্নেহ, শাসন মানুষকে পরবর্তী জীবনে টিকে থাকার মানসিক শক্তি যোগায়। বন্ধুরা, আশা করছি শৈশব নিয়ে লেখা নবারুণের এ সংখ্যা তোমাদের অনেক ভালো লাগবে।

শিশুদের প্রতি ভালোবাসা, নিরাপত্তা ও শিক্ষার বার্তা তুলে ধরে শিশুদের অধিকার ও কল্যাণের প্রতি সচেতনতা বাড়াতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অক্টোবর মাসের প্রথম সোমবার উদ্‌যাপন করা হয় বিশ্ব শিশু দিবস। বাংলাদেশেও প্রতিবছর যথাযোগ্য মর্যাদায় বিশ্ব শিশু দিবস পালন করা হয়। বিশ্বের সকল শিশুর জীবন হোক নিরাপদ। কারণ তারাই আমাদের সুন্দর আগামীর ধারক ও বাহক।

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা
ফোন : ৮৩০০৬৮৮
ই-মেইল:
editornobarun@dfp.gov.bd

বিক্রয়, বিতরণ ও প্রদর্শনী
সহকারী পরিচালক
ফোন : ৮৩০০৭০২

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ওয়েবসাইট : www.dfp.gov.bd

মুদ্রণ : মিতু প্রিন্টিং প্রেস অ্যান্ড প্যাকেজিং
১০/১ নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০

মূল্য: ২০.০০ টাকা।

প্রধান সম্পাদক
খালেদা বেগম

সিনিয়র সম্পাদক
শাহিদা সুলতানা

সম্পাদক
চৌধুরী সাহেলা পারভীন

সিনিয়র সহসম্পাদক
শাহানা আফরোজ

সহসম্পাদক
তানিয়া ইয়াসমিন শম্পা
মেজবাউল হক

সহযোগী শিল্পনির্দেশক
সুবর্ণা শীল

অলংকরণ
নাহ্‌রীন সুলতানা

সম্পাদকীয় সহযোগী
মো. মাছুদ আলম
সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

সূচি

নিবন্ধ

০৪ আনন্দময় শৈশব/ রফিকুর রশীদ
১৩ শৈশবের দিন-রাত্রি/ মুহা. শিপলু জামান
৩৩ শৈশবের খেলাধুলা/ এস আই সানী
৩৬ মধুময় বর্ষা/ রকিবুল ইসলাম
৪৬ আমাদের শৈশবের ছড়াগুলো/ আশিকুর রহমান
৫০ প্রকৃতির বন্ধু শামুক/ ম. জাভেদ ইকবাল
৫৩ ধুলোমাখা স্মৃতি/ মো. জাহিদ হাসান
৫৭ শূন্যে ভাসা পাখি/ মাহমুদা কামাল

গল্প

০৭ অন্য রকম/ সুজন বড়ুয়া
১৮ শৈশবের সেই দুপুরটা/ কুমার প্রীতীশ বল
২৩ দাদার শৈশব/ আব্দুস সালাম
২৭ শ্রাবণের সওদাগর/ চন্দনকৃষ্ণ পাল
৩০ আনন্দের দিনগুলো/ ইয়াসমিন আকতার

স্মৃতিকথা

৪০ শিউলি ফুলের দিনগুলো/ মীম নোশিন নাওয়াল খান
৪৩ গ্রামের দিনগুলো/ সানজিদ হোসেন

প্রতিবেদন

৫৬ বিশ্ব শিশু দিবস/আইউব সৈয়দ
৫৯ মিউনিখ ম্যারাথনে লাল-সবুজের পতাকা
তানিয়া ইয়াসমিন শম্পা
৬০ বন্ধু নাকি শত্রু/ সাদিয়া ইফফাত আঁখি

কবিতাগুচ্ছ

০৩ হাসান হাফিজ
১২ মো. ইউনুছ আলী
২২ মাহমুদা সিদ্দিকা/ হাফিয রেদওয়ান
সাদেকুল ইসলাম সাদেক
৩২ সাদিয়া আলম সিথী/ মো. আমিরুল ইসলাম
৪২ মনোয়ার হোসেন দুলাল/ রাজিবুল হাসান রাজিব
৪৫ রহমত আলী রুহিত
৫২ মো. সোলাইমান হাসান খোকা
৫৮ মুশফিকুর রহমান
৬০ হাসনাইন আহমদ
৬২ মো. সাজরুল ইসলাম সাজু
মো. মনিরুজ্জামান মনির

ছোটোদের ছড়া

২৬ নাওয়ার আলম

আঁকা ছবি

দ্বিতীয় প্রচ্ছদ : ইউসুফ হায়দার আদিব/ সাফিয়া নূর ঈদি
তৃতীয় প্রচ্ছদ : আমিরা ইসলাম/ আরিবা তাবাসসুম
৬৩ আরিশা হক/ ফারিনা আফরোজ
৬৪ আবিদা সুলতানা/ মো. আমিমুল ইহসান বসুনীয়া

নবারুণ পত্রিকা পড়া ও ডাউনলোড করা যাবে

Nobarun Potrika

www.dfp.gov.bd



ফিরে আসো যদি

হাসান হাফিজ

শৈশব তো দূরের নদী
আকাশ গাঙের মেঘের ভেলা
চড়ুইভাতি, একই সঙ্গে
লুকোচুরির দারুণ খেলা।
শৈশব তো ঘুড়ির উড়ান
লাট্টু, লাটিম ডাংগুলি ঢেউ
শিশুকাল তো স্বপ্ন সোনার
ভুলতে যেটা পারবে না কেউ।

শৈশব যে
আনন্দেরই উৎসব সে
উড়কি ধানের মুড়কি ও খৈ
ভুলতে তোমায় পারছি গো কই?

শৈশব তো মেঘনা গাঙে
হল্লাপাটি সাঁতার কাটা
উজ্জ্বল রং, নয় কিছুতেই সাদামাটা
ফুলের গন্ধে বাগান আকুল
মৌচাকে ঢিল, তিক্ত সে হুল
কেউ কি তাকে মাখছে গায়ে?
শৈশব যে হঠাৎ লুকায়
যায় পালিয়ে, ছোঁয়া না যায়
পালতোলা এক রঙিন নায়ে
পিছন পিছন ছুটছি যে তার
সামনে কিন্তু বিঘ্ন পাহাড়
যাচ্ছ কোথায়, নাহ যেয়ো না,
বন্ধু আমার, ভয় পেয়ো না।

তুমিই আমার সঙ্গী খেলার
দূর সুদূরের ছোট্টবেলার
বন্ধু তুমি ভোরের পাখি,
সকাল তবে হলোই নাকি?
পথচলা হোক জলদি শুরু
দেয়ার কী ডাক গুরু গুরু
ইলশেগুঁড়ি বিষ্টি নামে
ঝকর ঝকর ট্রেনটি থামে।
ও রেলগাড়ি, থাম তো বাবা
সন্দেশ আর মালাই পাবা
শৈশব গো খুঁজছি তোমায়
কষ্ট দারুণ, পাচ্ছি না হায়!
আবার যদি আসতে ফিরে
কখনো কী এমনটা হয়-
শৈশব তো কোনোকালেই
ফিরে আসবার পাত্র সে নয়।

আনন্দময় শৈশব

রফিকুর রশীদ

ছোট্ট বন্ধুরা, তোমাদের প্রিয় পত্রিকা নবারুণ এবার ঝলমলে রঙে রঙিন হয়ে সেজেছে শৈশব নিয়ে। জানি তোমরা সবাই শিশু। আছো তোমাদের শৈশবের সবুজ আঙিনায়। সবারই শৈশব থাকে। জন্মের পর সবাই প্রথমে পা রাখে শৈশবের উঠোনে। তারপর কৈশোর, তারুণ্য, যৌবন, বার্ধক্য...। বড়ো হতে হতে বুড়ো হয়ে যাওয়া। শত চেষ্টা করেও কেউ কোনোদিন শৈশবে ফিরে যেতে পারে না। অথচ সব মানুষেরই মনের মধ্যে গভীর ছায়া ফেলে রাখে শৈশব। মধুর সেই শৈশব সবাইকেই হাতছানিতে ডাকে –

‘আয় আয় আয়রে
শৈশবে যাইরে
মধুমাখা দিনগুলো ফিরে যদি পাইরে।’

না, শৈশবে ফিরে যাওয়া আর হয় না কিছুতেই। তোমরা আজকের শিশু। ধীরে ধীরে তোমরাও বড়ো হয়ে যাবে। পিছনে পড়ে থাকবে আনন্দময় শৈশব। অবুঝ সবুজ শৈশবের কথা তোমাদেরও মনে পড়বে কখনো কখনো। হয়ত শৈশবে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছেও জাগতে পারে কারো মনে। কিন্তু সেটা যে হবার নয় মোটেই। তখন খুব মন খারাপও হতে পারে। কিছুতেই যেহেতু স্মৃতিমাখা শৈশবে ফেরা যাবে না, তাই তোমরা এখনই জেনে নাও শৈশব কাকে বলে এবং মধুময় শৈশবের পরিধি কতদূর।

শৈশব মানে শিশুবেলা বা শিশুকাল। জন্মের পর থেকেই শুরু হয় শৈশব। এই শৈশবের সীমানা কতদূর পর্যন্ত ছড়ানো, তা নিয়ে নানান বিতর্ক আছে। শিশু কাকে বলে, কত বয়স পর্যন্ত শিশুকাল ধরা হবে এসব নিয়েও অনেকে অনেক রকম যুক্তির কথা বলেছেন। বড়ো হয়ে তোমরাও সে সব জানতে পারবে। সবার মতামতকে এক সূত্রে গেথে জাতিসংঘ এ নিয়ে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে এবং ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত শৈশবের সীমানা ঘোষণা করেছে। যেসব দেশ জাতিসংঘের সদস্য তারা এটা মান্য করে



বটে, তবু তর্কের শেষ হয়নি। বয়সের সীমা দিয়ে শৈশবকে চেনা যায়, বুঝা যায়। তবে বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য দিয়েও শিশুকে চেনা যায়। শৈশবে শিশুরা কী কী করে, কেমন করে হাত নাড়ে, পা বাড়ায়, কেমন করে হাসে, কেমন করে খেলা করে – এ সবই হচ্ছে শৈশবের বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণ। এ সব দিয়েও শৈশব চেনা যায়। মানুষের জীবনের সূচনা হয় শৈশবকাল দিয়ে। যতই অবুঝ আর সরলতায় ভরা হোক, জীবনের এই সময়পর্ব কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই পর্বের ওপরেই দাঁড়িয়ে থাকে গোটা জীবন। তাই সবারই উচিত শিশুর বেড়ে ওঠার এই সময়ের প্রতি যত্নবান ও মনোযোগী হওয়া।

ছোট্ট বন্ধুরা, তোমরা তো আসলেই ছোটো মানুষ। বয়সে ছোটো। আকৃতিতে ছোটো। হাত-পায়ের গড়ন ছোটো। জামাকাপড়, জুতো সবই লাগে ছোটো মাপের। কিন্তু তোমাদের বুকের ভেতরটা অনেক বড়ো। সেখানে কোনোরকম দাগ লাগেনি, ছায়া পড়েনি। একদম কাচের মতো টলটলে পরিষ্কার। আকাশের মতো উদার। এই কারণে শিশুদের নিয়ে যারা চিন্তাভাবনা করেন, তাদের মধ্যে কেউ কেউ শুধুমাত্র বয়সের মাপকাঠি দিয়ে শৈশবকে মাপতে চান না। শৈশবকে তারা মনে করেন মানবজীবনের অসাধারণ এবং অনন্য এক সময়। একজন শিশুর জন্মের পর থেকে যতদিন কোনো দায়িত্ববোধ না জন্মায়, কর্তব্যবোধ না জেগে ওঠে, এমনকি তার বিবেকবুদ্ধিরও কোনো বালাই থাকে না – সেটাই হচ্ছে তার শৈশবকাল। শিশু চোখ মেলে তাকাবে, মন খুলে হাসবে, হাত-পা নেড়ে খেলবে শুধুই আনন্দের জন্যে। শারীরিক কষ্ট পেলে শিশু কাঁদবে, ক্ষুধা-পিপাসার জন্যে কাঁদবে সেটাও স্বাভাবিক। এই কষ্টের কথা ভাষায় প্রকাশ করতেও জানে না শিশু। ধীরে ধীরে একটু একটু করে সবই জানবে। যতই জানবে ও বুঝবে, শৈশব থেকে ততই সরে যাবে সে, ঢুকে পড়বে কৈশোরের এলাকায়, তারপর তারুণ্যের সীমানায়। এভাবেই মানুষের বেড়ে ওঠা। বড়ো হয়ে যাওয়া। দায়িত্ব কাঁধে নেওয়া। কর্তব্য পালনের চেষ্টা করা। শিশু থাকে এ সবের বাইরে। সে থাকে অর্থহীন আনন্দের অনাবিল জগতে। বড়ো হওয়ার পরও মানুষ নানাভাবে আনন্দ পেতে পারে, কিন্তু শৈশবের মতো উদ্দেশ্যহীন এবং অর্থহীন আনন্দ আর কখনো পাওয়া সম্ভব নয়। শৈশব তাই অনন্য সুন্দর। বড়োই মধুর এবং আনন্দময় এই শৈশব।

ছোট্ট বন্ধুরা, এমন মধুর শৈশবের কথা কি তোমরা ভাবতে পারো? সেই শৈশবের কোনো আনন্দের কথা কি তোমাদের মনে পড়ে? শোনো বন্ধুরা, কোনো কিছু মনে পড়ার জন্যে সজীব, স্বপ্রাণ স্মৃতি থাকা চাই। ওই রকম প্রাথমিক শৈশবে স্মৃতির পর্দায় ছায়া পড়ে না বললেই চলে। মানুষের স্মৃতি গঠিত হয় কিছুটা বোধবুদ্ধি, আবেগ-অনুভূতি বিকশিত হলে তারপর। সেই পর্যায়ে আসতে আসতে মানবশিশুর পা পড়ে যায় কৈশোরের প্রাণচঞ্চল উঠোনে। তখন পরিবারে কিংবা পরিবারের বাইরে এসে সমাজে-স্কুলে-খেলার মাঠে অনেকের সঙ্গে মেলামেশার মধ্য দিয়ে তার আনন্দ-বেদনার স্মৃতির গঠন শুরু হয়ে যায়। শিশু মনের সাদা পাতায় দাগ পড়ে, নানা রঙের ছবি আঁকা হয়। ধীরে ধীরে শিশুর জগৎ অনেক বড়ো হয়ে যায়, রঙে-রসে ভরে যায়। তখন আনন্দের সাথে ভালো লাগা-মন্দ লাগার বোধও যুক্ত হয়ে যায়।

শৈশব এবং কৈশোর মিলেমিশে এই যে ছেলেবেলা বা ছোটোবেলা গড়ে ওঠে, তার অনেক উজ্জ্বল বর্ণময় স্মৃতি থাকে। বড়ো হবার পরও অনেকে অনেক সুন্দর করে সেই স্মৃতির বয়ান শোনাতে পারেন। বাড়িতে কিংবা বাড়ির বাইরে কতরকম স্মৃতি গড়ে ওঠে তার কি শেষ আছে! শুধুমাত্র স্কুল-জীবনের স্মৃতির গল্পই তো ফুরোতে চায় না। ঘুড়ির লাটাই থেকে সুতো ছাড়ার মতো করে স্মৃতির সুতো দিয়ে মালা গাঁথে কিংবা স্বপ্নের জাল বোনে মানুষ। মিটিমিটি আলো জেলে স্মৃতির জোনাকি দাপিয়ে বেড়ায় সারারাত। কবি-সাহিত্যিকরা তাঁদের অমর লেখনীতে লিখে প্রকাশ করেন শৈশবের আনন্দময় নানান স্মৃতির বিবরণ। তোমরা বড়ো হয়ে রবীন্দ্রনাথের 'আমার ছেলেবেলা' বা 'জীবনস্মৃতি' কিংবা শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' উপন্যাস পাঠের মধ্য দিয়ে পেতে পারো

শৈশব-স্মৃতির আনন্দ-আস্বাদ। আরো অনেকে লিখেছেন এমন সব স্মৃতিকথা। তবে হ্যাঁ, সে সবও কিন্তু বোধহীন শৈশবের গল্প নয়। শৈশবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে দুরন্ত কৈশোরের ঝাঁক ঝাঁক দুরন্তপনা এবং দুঃসাহসিকতার গল্প, অকপট সরলতা ও আবেগময় স্নেহ-ভালোবাসার গল্প। আরো আছে অপমানে-অভিমানে দুঃখ পাওয়ার গল্প। এইসব নিয়েই ছেলেবেলার স্মৃতিকথা। শৈশব-কৈশোর এবং তারুণ্য একেবারে গলাগলি করে জড়িয়ে ধরে গড়ে তোলে বহু রঙে রঙিন এই ছেলেবেলা। অনেক মানুষ পুরো সময়টাকেই শৈশব বলে চালিয়ে দিতে চান। এই সময়ে শিশুর শারীরিক, মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ ঘটে বলে জাতিসংঘের বিবেচনায় তারা ঠিকই বলেন।

বয়সের বিবেচনায় যারা জীবনের নানা অধ্যায়কে বিভাজন করেছেন, তাদের মধ্যে অনেকে শৈশবকেই তিন ভাগে ভাগ করেছেন। প্রথমে আসে অতি শৈশবকাল (Infancy) : জন্মের পর থেকে প্রায় দুই বছর পর্যন্ত এই সময়। অতি দ্রুত শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশ ঘটে এ পর্যায়ে। এরপর দ্বিতীয় পর্যায়কে বলে টডলার (Toddler): শিশু যখন নিজের ইচ্ছেমতো হাত-পা ছুড়তে এবং হাঁটতে শেখে তখন তাকে বলা হয় টডলার। শোয়া থেকে শরীরে মোচড় দিয়ে উঠে বসা এবং মাটিতে পা ফেলে উঠে দাঁড়ানো, হাঁটতে শুরু করা – মানবজীবনে এই চলমানতার গুরুত্ব অপরিসীম। তৃতীয় ধাপে আসে স্কুলে যাওয়ার সময়, অর্থাৎ পাঁচ বছরের পর থেকে শুরু হয় এ পর্ব। এই পর্যায়ে শিশুর মানসিক ও শিক্ষাগত বিকাশের সূচনা হয়। শৈশবকালে শিশুদের বিকাশ এত দ্রুত হয় যে অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তাদের বড়ো পরিবর্তন দেখা যায়। মনোবিজ্ঞানীরা শৈশবকালকে মানুষের বিকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ সময় হিসেবে বিবেচনা করেন। কারণ এই সময়েই মানুষের ব্যক্তিত্বের ভিত রচিত হয়।

ছোট্ট বন্ধুরা, এই পৃথিবীতে সব মানুষেরই একটিমাত্র জীবন। একবারই জন্মগ্রহণ করে মানুষ। তারপর সেই জীবনকে আনন্দ-বেদনায় নিয়ে বয়ে চলে মৃত্যু পর্যন্ত। এই চলাটা তো শুরু হয় শৈশব থেকেই। এই চলতে শেখার ওপরই নির্ভর করে পুরোটা জীবন। কাজেই চলতে শেখার সূচনা হয় যে শৈশবে, সেই সোনালি শৈশবের প্রতি সবাইকে গুরুত্ব দিতে হবে। মা-বাবা তো শিশুর প্রতি দায়িত্ব পালন করেই থাকেন, এক্ষেত্রে শিশুদেরও বেশ কিছু দায়িত্ব আছে। তোমরা যারা শৈশবের তৃতীয় পর্যায়ে আছো কত কিছু নিয়ে তোমাদের মনে কত প্রশ্ন জাগে, সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে কল্পনা করো, চিন্তাভাবনা করো, তারপর সাহস করে নতুন পথ বের করে নাও – এভাবেই তো শৈশবে গড়ে ওঠে সারাজীবনের ভিত। তোমরা যেন শিশুবেলা বা ছোটোবেলা বলে করো না হেলা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমাদের শিখিয়েছেন : 'জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা।' ❑

কথাসাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ

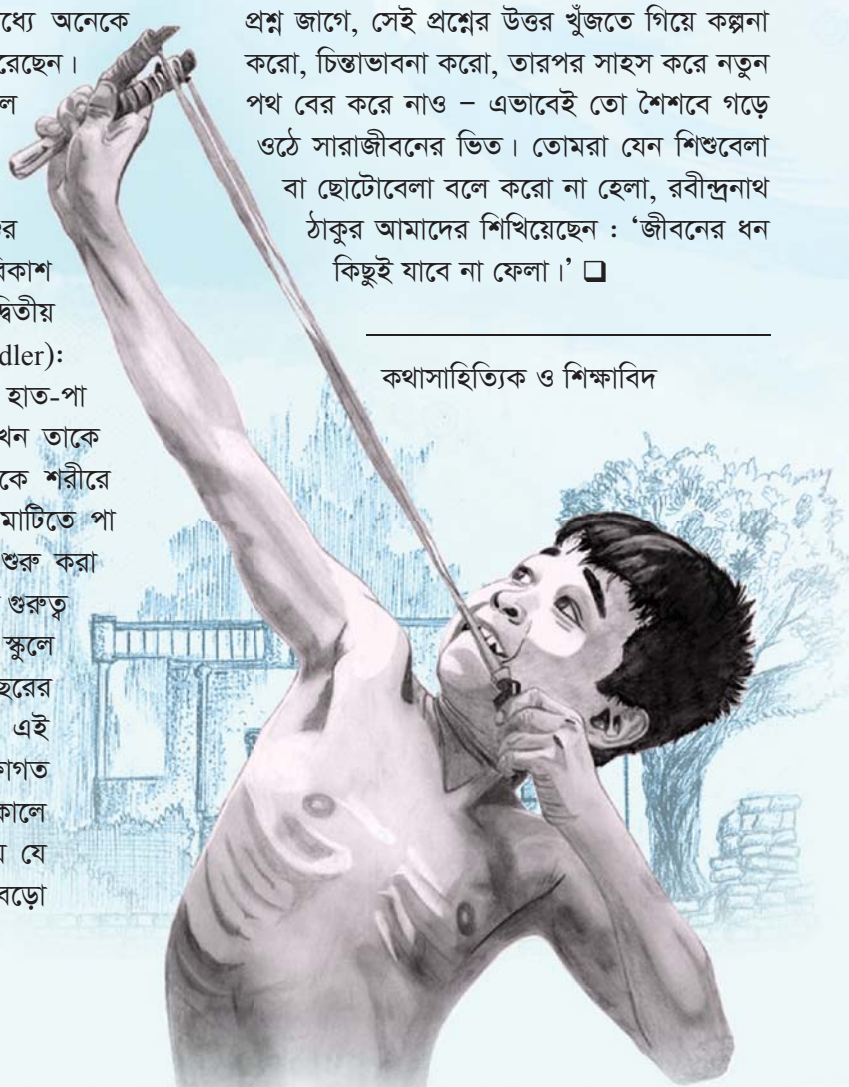

অন্য রকম

সুজন বড়ুয়া

সেই মেয়েটার কথা কিছুতেই ভুলতে পারে না দোলন আর চাঁপা। কী করে ভুলতে পারবে? এমন দৃশ্য যে জীবনে প্রথম দেখেছে তারা।

দোলন-চাঁপা ভাবতে পারেনি বাড়িতে এলে এত নতুন কিছু দেখবে, এত আদর-কদর হবে আর তাদের ঘিরে এমন চাঁদের হাট বসবে। আনন্দ আয়োজনে তাদের রীতিমতো হাঁপিয়ে ওঠার জোগাড়। দাদা-দাদি ছাড়াও সব চাচা-চাচি, ফুপু, খালা, ভাইবোন এত রাত পর্যন্ত তাদের জন্য অপেক্ষা করে থাকবে তাও বুঝে উঠতে পারেনি তারা। আরো আগে বাড়ি পৌঁছানোর কথা থাকলেও মাঝখানে গাড়ি বিভ্রাটে পৌঁছাতে দেরি হয়ে গেল বেশ।

দোলন ও চাঁপা দুই ভাইবোন। ঠিক দুই বছর পর গ্রামের বাড়িতে এসেছে বাবা-মার সঙ্গে। ঢাকায় থাকে তারা। ঢাকার স্কুলে লেখাপড়া করে। দোলন ক্লাস সেভেনে আর চাঁপা ফাইভে পড়ে। দোলন-চাঁপার বাবা ইমরুল চৌধুরী এ বাড়ির বড়ো ছেলে। বাড়িতে তার ছেলে-মেয়ের এমন আদর-কদরই তো হওয়ার কথা। গ্রামের নিকট স্বজনদের মায়া-ভালোবাসার টান কাছে না এলে শহরের ছোটো ছেলে-মেয়েরা বুঝবে কী করে! একজন এদিকে টানে তো আরেকজন ওদিকে, এরপর কোলেও নিতে চায়। শেষে কিনা ক্লাস সেভেনে পড়া দোলনকে কোলে নিতে গিয়ে বড়ো ফুপুর পরনের শাড়িটাই ফেঁসে গেল খানিকটা। কিন্তু ওতে আফসোস নেই কারো। ফুপু তো হেসেই সারা। ভাইপো-ভাইঝিকে এতদিন পর কাছে পেয়ে আদর করতে পারছে এতেই দারুণ খুশি। দাদি-চাচির হাতে বানানো গ্রামের পিঠা-পুলি, গরম গরম খাবারদাবারে শেষ হয়েছিল রাতের পর্ব।



সকালবেলা নাশতার টেবিলে অপেক্ষা করছিলেন বাবা– দোলন আর চাঁপা কখন টেবিলে আসবে? ঢাকায় সকালের নাশতা একসঙ্গে করা সম্ভব না হলেও গ্রামের ব্যাপারটা আলাদা। এখানে কারো তেমন ব্যস্ততা নেই। রাতে ঘুমাতে যাওয়ার সময় বাবা বলে রেখেছিলেন সকালে একসঙ্গে নাশতা করতে হবে, যেন সকাল সকাল উঠে যায়। রাতে দোলন শুয়েছে দাদার সঙ্গে। আর চাঁপা শুয়েছে দাদির সঙ্গে। দাদা-দাদি এতদিনে যেন তাদের আসল সঙ্গী খুঁজে পেয়েছেন। ঘুমিয়ে পড়ার আগে পর্যন্ত নতুন সঙ্গীদের গল্প শুনিয়েছেন তারা। তাই কি এত বেলা হওয়ার পরও ঘুম ভাঙছে না?

নাশতার টেবিল ছেড়ে দেখতে এলেন বাবা। দোলন-চাঁপা দুজনকে একসঙ্গেই দাদির ঘরে পেলেন তিনি। জানালার পাশে দুজনই বসে আছে মনমরা হয়ে। বাবা বলেন, তোমরা এখানে? নাশতা খাওয়ার সময় তো বয়ে যায়। সবাই অপেক্ষা করছে। নাশতার টেবিলে এসো।

দোলন-চাঁপা বাবার দিকে ফিরে বলল, বাবা, এখানে অনেক গরম। ইলেকট্রিসিটি নেই!

বাবা সস্নেহে হাত ধরে নিয়ে এলেন ছেলে-মেয়েকে। মুখে কিছু না বলে হাসলেন। গ্রামের জীবন। যখন-তখন বিদ্যুৎ চলে যাওয়া এখানে খুব সাধারণ ঘটনা। তবু শহরের তুলনায় গ্রামে গরম কম। দোলন-চাঁপা এমন পরিবেশে নতুন। তাদের মানিয়ে তোলা দরকার। তিনি হেসে বলেন, একটু পর এই গরম তোমাদের ভালো লাগবে।

দোলন বলল, আচ্ছা বাবা, ইলেকট্রিসিটি না থাকলে তো ইন্টারনেটও থাকবে না। মোবাইল-ফেসবুক চলবে না। আমাদের সময় কাটবে কী করে?

সময় কাটানোর কথা ভাবছ? এখানে এতকিছু করার আর দেখার আছে যে সময় কীভাবে কেটে যাবে তোমরা বুঝতেই পারবে না। তখন তোমাদের মনে হবে আরেকটু সময় পেলে আরো মজা হতো। বাবা বলতে বলতে হাসেন।

নাশতার টেবিলে বসেছিলেন দাদা ভাইও। তার দু'পাশে বসেছে দোলন ও চাঁপা। তিনি নাতি-নাতনির খাওয়া তদারকি করছিলেন। এবার তিনি আর চুপ থাকতে পারেন না। দোলনের দিকে তাকিয়ে বলেন, আচ্ছা দাদু ভাই, তোমরা তো জানো, আগের দিনে কিন্তু মোবাইল, ইন্টারনেট, ফেসবুক, ডিভাইস, গেমস এসব ছিল না। তখনো আমরা গ্রামেই ছিলাম, গ্রামেই বড়ো হয়েছি। তোমাদের বাবা-চাচারাও গ্রামে বড়ো হয়েছে। ছোটোবেলায় তারা তো মোবাইলই দেখেনি। কারণ তখন মোবাইলের চল ছিল না। গ্রামে খেলাধুলা, পড়াশোনা করেই তাদের দিব্যি সময় কেটেছে।

দাদার কথা শুনতে শুনতে বাবা মাথা নিচু করে খাচ্ছিলেন। নিজের ছেলে-মেয়ে দুটির জন্য হঠাৎ কেমন যেন কষ্ট হলো তার। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই তারা চাকরিজীবী। ছেলে-মেয়ে দুজন স্কুল ছুটির পর বাসায় ফিরে থাকে নিজেদের মতো! মোবাইল, ইন্টারনেট, ফেসবুকের রঙিন জগতে সময় কাটে তাদের। সাপ্তাহিক ছুটিগুলোও তাদের কেটে যায় নাচ, গান, আঁকা শেখা, কোচিং ক্লাস এসবে। বাইরে ঘুরেও যে সময় কাটানো যায় তা আর তারা জানবে কী করে? চার দেয়ালের মাঝেই বন্দি তাদের জীবন। আহা, এই সময়ের শৈশব! অথচ আমাদের ছেলেবেলা ছিল সোনায় মোড়া আনন্দে ভরপুর। বাঁধনহারা ঘুরে বেড়ানো আর অবাধ উদ্দাম খেলাধুলা। আমাদের ছেলেবেলা কত সহজ ছিল! এখন শৈশবের সব আনন্দ যেন যন্ত্রে বাঁধা। এই যন্ত্র-ছক থেকে বের করে মাঝে মাঝে যে গ্রামে আনব তারও সুযোগ হয় না। ওদেরই বা দোষ কী! বাবা নিজেকে সামলে নিয়ে বলেন, তোমরা গ্রামে বেড়াতে এসেছ, গ্রামটা ঘুরে দেখো। এখানেও অনেক কিছু দেখার আছে, চেনার আছে।

তোমাদের দুজনের নাম মিলে কিন্তু একটি ফুলের নাম হয়। সে ফুলের নামটা কী বলো তো? দাদা ভাই চায়ে চুমুক দিতে দিতে বলেন।

বাহ্ রে, দোলনচাঁপা। ঝটপট উত্তর দেয় দোলন।

দাদা ভাই আবার বলেন, তাহলে বলো, দোলনচাঁপা ফুলটা দেখতে কেমন? ফুলটা কি তোমরা চেনো?

দোলন আর চাঁপা এবার চুপ। দুজনেরই চোখে-মুখে কাঁচুমাচু ভাব।

চেনো না তো দাদা ভাই, ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা নেই। তোমাদের সে ফুল চিনিয়ে দেওয়ার সুযোগ আসলে আমরাই পাইনি। এবার চিনে নাও।

আমাদের বাগানেই ফুলটা আছে। সাদা রঙের ফুল। সন্ধ্যায় ফোটে।

মনে রেখো গ্রীষ্ম থেকে শরৎকাল পর্যন্ত দোলনচাঁপা ফুটতে দেখা যায়। আর এখন তো শরৎকাল।



বাবা হাসিমুখে দাদা ভাইয়ের কথাগুলো শুনছিলেন। তিনিও দাদা ভাইয়ের কথায় সুর মেলান, যাও, নাশতা খেয়ে লেগে যাও। গ্রামে যত ফুল-পাখি আছে সব এবার শিখে নেওয়া চাই। আমরা কিন্তু পরে পরীক্ষা নেব।

দুপুর বেলা খাওয়ার টেবিলে আবার সবার দেখা। বাবা জানতে চাইলেন, আজ সকালবেলা কেমন কাটল তোমাদের? তোমরা নতুন কী কী দেখলে আর শিখলে বলো।

দোলন আর চাঁপা দুজনই একসঙ্গে বলে উঠল, আমরা বাগানে দোলনচাঁপা ফুল দেখেছি। পাতার মতো লম্বা পাপড়ির ছড়ানো ফুল।

সাদা রং, একটু সুগন্ধও আছে।

দাদা ভাই আদুরে গলায় বলেন, আর কী কী ফুল দেখলে?

চাঁপা তড়বড় করে বলল, আমি জবা ফুল দেখেছি। লাল, গোলাপি দু'রকম।

দোলন বলল, আমি কলকে ফুল দেখেছি, হলুদ রং। ঝুলে আছে গাছে।

বাহ্ বাহ, বেশ। আর?

মাছরাঙা পাখি দেখেছি, ছোঁ মেরে পুকুরে মাছ ধরছে। একটা ছোটো মাছ ঠোঁটের আগায় চেপে উড়ে গিয়ে গাছের ডালে বসল। দোলনের চোখে-মুখে বিস্ময়।

দাদা ভাই নাতিকে উৎসাহ দিয়ে বলেন, সুন্দর না?

এ সময় হঠাৎ চোখ গোল গোল করে তাকায় চাঁপা, জানো বাবা, আজ দেখি, আমার থেকে ছোটো একটা মেয়ে পুকুরে সাঁতার কেটে গিয়ে শাপলা তুলে আনল।

বাবা জানেন যে গ্রামে এটা কোনো ব্যাপার নয়। ছোটো বয়সেই এখানে সবার সাঁতার শেখা হয়ে যায়। চাঁপা বা দোলন কেউই সাঁতার জানে না। তাই পুকুরে সাঁতরে ছোটো মেয়ের শাপলা তোলা দেখে অবাক হয়েছে। বাবা এবার ছেলে-মেয়েকে সহজ করার জন্য বলেন, তোমরাও পুকুর থেকে শাপলা তুলবে নাকি? কিন্তু তোমরা তো সাঁতার শেখোনি।

দাদা ভাই বলেন, আমার দাদুদের সাঁতারটাও এবার শিখিয়ে নাও ইমরুল। আমি বলে দিচ্ছি, মুকুল দোলনকে সাঁতার শেখাবে আর নবীনা চাঁপাকে সাঁতার শেখাবে।

মুকুল আর নবীনা হলো দোলন-চাঁপার ছোটো চাচা আর ছোটো ফুপু। মুকুল একাদশ শ্রেণিতে আর নবীনা দশম শ্রেণিতে পড়ে। দোলন-চাঁপা এমনিতেই তাদের আদরের ধন। আগে থেকেই দোলন-চাঁপাকে মাথায় করে রেখেছে তারা। এবার তাদের বাবার আদেশ পেয়ে আরো সতর্ক, ভাতিজা-ভাতিজিকে চোখের আড়াল হতে দেয় না মুহূর্তের জন্য। অন্য কারো সঙ্গে পুকুরে নামতেও তারা নিষেধ করে দিল দোলন-চাঁপাকে।

মুকুল চাচা আর নবীনা ফুপু বাড়ি না থাকলে দোলন-চাঁপা খেলে আর ঘুরে বেড়ায় অন্য ভাইবোনদের সঙ্গে। বড়ো পরিবার, অনেক চাচাতো, ফুপাতো, খালাতো ভাইবোন তাদের। সবাই স্কুলে পড়ে। তবু সব সময় কেউ না কেউ থাকে দোলন-চাঁপার সঙ্গে। একা একা খুব একটা বাড়ির বাইরেও যায় না তারা। গ্রামের পথঘাট-মাঠ এরই মধ্যে মোটামুটি চেনা হয়ে গেছে তাদের। যেদিকে যায় সব নতুন আনন্দ। খেলাধুলা, সাঁতার শেখা, ফুল-পাখি দেখা। এখন মোবাইলে গেম খেলা আর ফেসবুকে রিলস দেখার কথা মনেই হয় না। গ্রামের আনন্দ যেন ছাপিয়ে গেছে শহুরে যন্ত্রের আনন্দকে। সারাদিন কেবল ঘুরে বেড়ানো গ্রামের এদিক-ওদিক। এরই মধ্যে দেখা হয়ে গেছে দোয়েল, শ্যামা, শালিক, টুনটুনি পাখি আর কদম, কেয়া, দোপাটি ফুল। আহা, জানাচেনার কত আনন্দ!

এখন সকাল গড়িয়ে দুপুর হয়ে এসেছে। আজ দোলন-চাঁপা ঘুরতে বেরিয়েছে খালাতো ভাই বিপুলের সঙ্গে। বিপুল ক্লাস এইটে পড়ে। একটু আগেই স্কুল থেকে ফিরেছে। দোলন-চাঁপাকে নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে সে চলে এসেছে বিলের দিকে। বিলের মাঝখান দিয়ে পূর্ব-পশ্চিমে আড়াআড়ি রাস্তা। রাস্তার দু'পাশে ধানিজমি। এখন জমিতে ধান লাগানোর মৌসুম। ক্ষেতে ক্ষেতে ধান লাগানোর কাজ করছে চাষিরা। কেউ ধানের চারা লাগাচ্ছে, কেউ হাল চাষ করছে জমিতে। ছেলেদের সঙ্গে কাজ করছে মেয়েরাও। দোলন-চাঁপার কাছে এসব একেবারে অবাক করা দৃশ্য। গ্রামের কৃষক-চাষিরা এত কষ্ট করে ফসল ফলায়!

রাস্তার দু'পাশের দৃশ্য দেখতে দেখতে ছড়ার পাড়ে এসে দাঁড়িয়েছে বিপুলরা। ছড়াটা উত্তর-পূর্ব দিক থেকে নেমে এসে বাঁক নিয়ে চলে গেছে দক্ষিণে। ছড়াটা চওড়ায় পঁচিশ-ত্রিশ হাত হবে। ছড়ার ওপর করা আছে পাকা পুল। দোলনরা পুলের ওপর দাঁড়িয়ে দেখছে নিচের দিকে। নিচে ছড়াটা জলে টলমল। পানির স্রোত বোঝা যায় না। দু'পাড়ের ধার

ঘেষে ঘন হয়ে ফুটে আছে শাপলা। সাদা আর লাল-বেগুনি মেশানো রং। ফুলগুলো পানির ওপর মাথা তুলে তাকিয়ে আছে যেন। কী সুন্দর!

মুগ্ধ হয়ে দেখতে দেখতে হঠাৎ চোখ আটকে গেল দোলন-চাঁপার। সেদিনের সেই মেয়েটা শাপলা তুলছে আজও। তার দু'হাতে শাপলার আঁটি। চাঁপা চমকে গিয়ে বলে উঠল, ওই যে সেই মেয়েটা।

বিপুল বলল, হ্যাঁ, ওর নাম ময়না। শাপলা তোলাই ওর কাজ।

এত ছোটো মেয়ে, বিলের মাঝখানে ছড়ার পানিতে একা একা নেমে শাপলা তোলে! ওর কি ভয় লাগে না? পানিতে সাপ-জোঁক থাকতে পারে। ভাবতেই কেমন শিউরে ওঠে দোলন। ময়নার সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে হলো তার। বলল, চলো, আমরা ময়নার কাছে যাই। একটু কথা বলি।

রাস্তার পুল থেকে ছড়ার পাড়ে নেমে যাওয়ার পথ আছে। দোলন-চাঁপাকে নিয়ে সেই পথ ধরে বিপুল। ধীর পায়ে ময়নার কাছে এসে ছড়ার পাড়ে দাঁড়ায়। ময়নার ওদিকে খেয়াল নেই। সে এক বুক পানিতে দাঁড়িয়ে ডাঁটাসহ শাপলা তুলছে একমনে। বিপুল তাকে ডেকে বলল, এই যে ময়না, আমরা তোমাকে দেখতে এসেছি।

ময়না ফিরে তাকায়। কিন্তু কোনো কথা বলে না।

এবার দোলন বলল, ময়না, আমরা ঢাকা থেকে গ্রামে বেড়াতে এসেছি। কাছে এসো, একটু কথা বলি।

ময়নার কী মনে হলো কে জানে? পানি ঠেলে এগিয়ে এল পাড়ের দিকে। আগেই সে পাড়ের ওপর জড়ো করে রেখেছিল কিছু শাপলা। হাতের দু'আঁটি শাপলাও রাখল সেখানে।

এত শাপলা তুলে কী করো তুমি? দোলন জানতে চায়।

হাটে নিয়া বেচি। সেই টেকা দিয়া চাইল, ডাইল, তেল কিনা আনি। ময়নার সোজা উত্তর।



দোলন বুঝে গেল শাপলা তোলা ময়নার খেলা না, বাঁচার লড়াই। তার কি আর কেউ নেই? খুব ইচ্ছে হলো জানতে। দোলন এবার বলে, তোমার বাড়িতে আর কে কে আছে?

আমি নানির কাছে থাহি। আমার আর কেহ নাই। আমার নানি ম্যালা বুড়া। কাজকাম বেশি কইরতে পারে না। একটানা কথাগুলো বলে যায় ময়না।

হায়, ময়নার কত কষ্ট! মা-বাবা কেউ নেই! বাঁচার জন্য সব কাজ নিজেকেই করতে হয় তার। অথচ তার বয়সে আমরা মা-বাবার অসীম আদর-ছায়ায় থাকি, খাইদাই আর ভাবনাহীন ঘুরে বেড়াই। ভাবতেই দোলনের মায়া হলো ভীষণ। সে বলল, ময়না, শাপলা বিক্রি করে তুমি দিনে কত টাকা পাও?

এই পঞ্চাইশ-ষাইট টেকা পাই।

দোলন আর কথা বাড়ায় না। বলে, ময়না, তোমার আজকের সব শাপলা আমরা কিনে নেব। তুমি আমাদের বাড়ি চলো। বাবা তোমার শাপলার দাম ঠিক দিয়ে দেবে।

ময়নার চোখমুখ হঠাৎ চকচক করে উঠল। কিন্তু কেমন যেন অবিশ্বাসে সে বিপুলের দিকে তাকায়। বিপুল ততক্ষণে শাপলাগুলো দু'হাতে কুড়িয়ে জড়ো করে বুকে তুলে নিতে ব্যস্ত। তবু সে ময়নার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসে, চলো ময়না, তুমি টাকার জন্য ভেবো না। খালু তোমাকে আরো বেশি টাকা দিয়ে দেবে।

বাড়ির পথে হাঁটতে হাঁটতে দোলন ভাবে, কালকেই আমরা ঢাকা চলে যাব। অথচ গ্রামে এখনো কত কিছু দেখা বাকি। মোবাইল, ডিভাইস, ইন্টারনেটের রঙিন জগৎ থেকে গ্রামের এসব দৃশ্য-কল্প কোনোভাবে খাটো নয়, বরং অনেক আকর্ষণীয়। বাবাকে বলে এখন থেকে ঘন ঘন গ্রামে আসতে হবে। সত্যি, গ্রামেও কতকিছু দেখার আছে, জানার আছে! ❑

শিশুসাহিত্যিক, সাবেক উপপরিচালক, বাংলাদেশ শিশু একাডেমি, ঢাকা

হারানো দিন

মো. ইউনুছ আলী

শৈশব মানে কাদা মাখা পা,
বৃষ্টিভেজা বিকেল, খালি গাঁ।
বই ফেলে মাঠে দৌড়,
সূর্য ডোবার আগে ঘর।

ভাঙা খেলনা, কাঠের গাড়ি,
ছিল অমূল্য ধন।
বন্ধুর সাথে সারাদিন,
ঝগড়া শেষে আপনজন।

শৈশব আছে স্মৃতি হয়ে,
হৃদয়জুড়ে গান।
হারিয়ে গেলেও সোনালি দিন,
তবু দেয় শান্তির প্রাণ।





শৈশবের দিন-রাত্রি

মুহা. শিপলু জামান

সকাল বেলার শুভ্রতা নিয়ে ঘুম ভেঙে দূর থেকে কানে আসে পাশের বাসায় শিশুদের সমস্বরে আরবি পাঠ মানে পবিত্র কোরান পড়ার সুমধুর সুর। তখনো রাস্তায় সকল মানুষ বের হয় নাই, কর্মজীবী বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার কিছু মানুষ কাজের খোঁজে যাত্রা শুরু করেছে। রাস্তার পাশে চিড়া-মুড়ির মোয়া, মিস্টি আলু সিদ্ধ, আলুর দম, বাখরখানি-মিষ্টি আরো কত কিছুর পসরা নিয়ে বসেছে অনেকে।

ঘরে ঘরে মক্তব আর লেখাপড়ার এক অনন্য সুন্দর আবহ। ভোরের নীরবতা ভাঙাতে বাসা-বাড়ি থেকে ভেসে আসে বাচ্চাদের আওয়াজ ;

> ‘সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি,
> সারাদিন আমি যেন ভালো হয়ে চলি।
> আদেশ করেন যাহা মোর গুরুজনে,
> আমি যেন সেই কাজ করি ভালো মনে।

কবি মদনমোহন তর্কালঙ্কার রচিত এই কবিতা দিনের শুরুতে আমাদের শৃংখলা আর নিয়মানুবর্তিতা শিক্ষা দেয়। বাসায় সকালের পড়ার পর্ব শেষ করে দলবদ্ধ হয়ে কিংবা বাবা-মার হাত ধরে পাঠশালার দিকে রওনা হয় কেতাদুরস্ত ছাত্রছাত্রীর দল। শৈশবে একটি দিন এভাবেই শুরু হতো আমাদের। দিনগুলো আমাদের কাছে ছিল স্বপ্নের মতো। কিন্তু স্বপ্নময় আনন্দের দিন বেশিদিন স্থায়ী হয় না। শৈশব পেরিয়ে জীবনের পথচলা সেই দিনগুলো বেঁধে রাখতে দেয় না। জীবন চলে যায় জীবনের নিয়মে।

জন্মের পর থেকে কৈশোর বা বয়ঃসন্ধিকালের পূর্বের সময়টাকে শৈশব বলে। ইউনিসেফের মতে ‘শৈশব

বলতে জন্ম এবং প্রাপ্তবয়স্কতার মধ্যবর্তী সময়ের চেয়ে অনেক বেশি কিছু বোঝায়। এটি একটি শিশুর জীবনের অবস্থা এবং সেই বছরগুলোর গুণমানকে বোঝায়'। শৈশব শব্দটির সঙ্গে শুধু শিশু নয়, তার চারপাশের পরিবেশ, সক্ষমতা, বিকাশের সম্ভাবনা, বিকশিত হওয়ার পথসহ আরও অনেককিছুই জড়িয়ে থাকে। শৈশব মানেই দুরন্তপনা। শৈশব মানেই স্মৃতি ও স্বপ্ন-জাগানিয়া সৃষ্টি সুখের উল্লাসে কাটানো সময়। শৈশব মানে হাসি আনন্দে মাতানো ভোর, রাজ্য জয়ের গান। শৈশব মানে কাদায় মাখামাখি, মনোহারিতা পাখির কলতান। শৈশব হচ্ছে হৈ-হুল্লোড় করে কাটানো বেলা,মায়ের রাগিণী চোখ, মমতার পেয়ালা। ভোরের আলো যেমন দিনের পরিচয় দেয়, তেমনি শৈশব একজন মানুষের পূর্ণতার গতিপথ নির্দেশ করে। শৈশবের স্মৃতিকে আঁকড়ে ধরেই বেঁচে থাকে প্রতিটি মানুষের আত্মা। পরিপূর্ণ জীবনে সে যতই প্রতিষ্ঠিত হোক না কেন শৈশবের স্মৃতির কাছে সে একজন শিশুই রয়ে যায় চিরদিন। তার শিশু মন বারবার ফিরে যেতে চায় শৈশবের সোনালি দিনে।

বিজ্ঞান আর তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়নে বর্তমান প্রজন্মের শৈশব অনেকটাই যান্ত্রিক হয়ে যাচ্ছে। হারিয়ে গেছে শৈশবের দুরন্তপনা আর প্রকৃতির আলিঙ্গন, শৈশবের আবেগ, ভালোবাসা আর তাদের নিদারুণ সম্পর্ক। ইট, কংক্রিটের ফ্ল্যাট কালচারের আড়ালে শিশুরা ঠিকই বড়ো হচ্ছে– তবে তারা পাচ্ছে না সোনালি রোদের আলো, বর্ণিল মেঘের ছায়া, রংধনুর আলোর ঝলকানি অথবা নির্মল দামাল বাতাসের দমকা! এখন দাদা বাড়ি, নানা বাড়ি বা মামার বাড়ি বেড়ানো উচ্ছ্বাস শিশুদের জীবনে নেই। শহুরে শিশুরা নদী দেখে না, সাঁতার জানে না। ঝড়ের দিনে আম কুড়ানোর অসাধারণ রোমাঞ্চকর সাহসিকতা তাদের জীবনে ঘটে না! কারণ, পারিবারিক সংস্কৃতি আজ বিলুপ্ত প্রায়। শিশুরা পাচ্ছে না যৌথ পারিবারিক বন্ধনের আনন্দমুখরতা। পারিবারিক আবহে বেড়ে উঠা, চাচাতো-মামাতো ভাই-বোনের ঝগড়া, খুনসুটি আর আনন্দ-বেদনা। বিচ্ছিন্ন, ছন্নছাড়া পরিবারগুলোর মধ্যে নিরানন্দ বিষণ্নতায় শৈশব কাটছে। এখন আর আমরা কবি জসীমউদ্‌দীনের সেই কবিতাও চর্চা করি না,

আয় ছেলেরা, আয় মেয়েরা ফুল তুলিতে যাই
ফুলের মালা গলায় দিয়ে, মামার বাড়ি যাই
ঝড়ের দিনে মামার দেশে, আম কুড়াতে সুখ
পাকা জামের মধুর রসে, রঙিন করি মুখ।

শৈশবের স্মৃতির কথা মনে করতেই চোখের সামনে ভেসে আসে কত-না মধুর স্মৃতি। শৈশবের গল্প মানেই সকাল-সন্ধ্যায় দাদা-দাদির কোলে বসে নানা রকম মজার গল্প শোনা। বিকালে বাড়ির সামনে পড়ে থাকা জমিতে পাড়ার সব ছেলেমেয়েরা জড়ো হয়ে লুকোচুরি, গোল্লাছুট, চি-বুড়ি, কুতকুত, দাঁড়িয়াবান্দা, সাতধাপ্পা, চোর-পুলিশ খেলা। শীতের সকালে ঘুম থেকে উঠেই খেজুরগাছ থেকে গাছির রস পাড়ার দৃশ্য দেখতে ছুটে যাওয়া, আবার শিমুল ফুল কুড়াতে যাওয়া, পাড়ার কারো কিংবা নিজেদের কুলগাছের কুল-বরই কুড়ানো, স্কুল থেকে ফিরে ব্যাগ রেখেই ফুটবল নিয়ে মাঠে দৌড়, সন্ধ্যায় ঘর্মাক্ত শরীরে ঘরে ফিরে বই নিয়ে বসা আর ভাই-বোন মিলে বানান করে পড়া মুখস্ত করা কেবল শৈশবেই সম্ভব। সেসময় সুন্দর সুন্দর কবিতা পড়তে পড়তে আমরা চলে যেতাম স্বপ্নের জগতে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আমাদের ছোট নদী' কবিতা পড়লেই যেমন চোখের সামনে ভেসে উঠত জীবন্ত গ্রামের প্রতিচ্ছবি।

'আমাদের ছোটো নদী চলে বাঁকে বাঁকে
বৈশাখ মাসে তার হাঁটু জল থাকে।
পার হয়ে যায় গোরু, পার হয় গাড়ি,
দুই ধার উঁচু তার, ঢালু তার পাড়ি'।

কিন্তু দুঃখের কথা হচ্ছে বর্তমানে আধুনিকায়ন ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যুগে তৈরি হচ্ছে ডিজিটাল প্রজন্ম। ছেলে-মেয়েদের শৈশবের দুরন্তপনা এখন প্রযুক্তির দেয়ালে বন্দি। যে বয়সে ছেলে-মেয়েদের বাধাহীন জীবনযাপন, খেলার মাঠে ছুটে চলা, বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডায় মেতে ওঠার কথা সে বয়সেই ছেলেমেয়েরা ঘরবন্দি থেকে স্মার্টফোনসহ প্রযুক্তিগত বিভিন্ন ডিভাইসের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েছে। বিশেষ করে শহরাঞ্চলে ক্রমশ

পরিবর্তনে রূপ নিয়েছে ছেলেমেয়েদের বর্তমান শৈশব। আজকাল দেখা যায় একটি শিশুর শৈশবটাই শুরু হয় যান্ত্রিকতার মাঝে। সকাল হতে না হতেই শিশুর কান্না থামাতে বা তাকে শান্ত রাখতে বাবা-মা হাতে কার্টুন বা তার পছন্দমতো ভিডিও চালু করে ডিভাইসটি ধরিয়ে দিয়ে নিজের গৃহস্থ কাজকর্ম সামলান। পরে অন্য সকল কাজ করেন। কথাটা দুঃখজনক হলেও সত্যি। অনেকের মুখে শুনতে পাওয়া যায়, তাদের শিশুরা ফোনের ভিডিও না দেখালে খেতেই চায় না। অনেক শিশু-কিশোররা স্কুল শেষে স্মার্টফোন/ডিভাইস হাতে বসে যায় অনলাইন গেমসে। যখন তাদের হৈ-হুল্লোড় করে হাসি আনন্দে কাটিয়ে বিকশিত হওয়ার সময়, তখন তাদের এই বিপর্যয়। যুগের পরিবর্তনে হয়ত তাদের মুখে শুনা যাবে এ যুগটাই তাদের সুবর্ণ শৈশব। আর কালের বিবর্তনে হারিয়ে যাবে প্রকৃতির পরশে তৈরি যান্ত্রিকতা-মুক্ত আমাদের শৈশব।



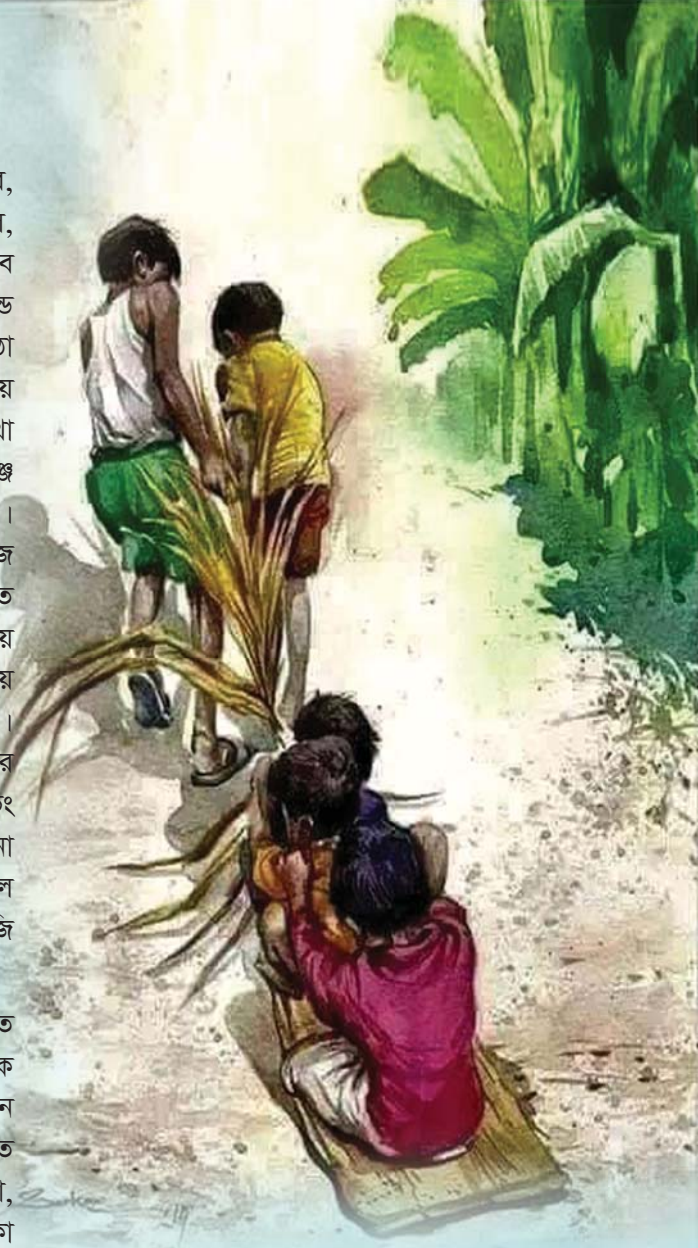

প্রকৃতির সাথে শিশুদের পরিচয় করিয়ে দিতে হবে, তাহলে তারা হয়ে উঠবে প্রকৃতির মতো সহজ-সরল, পরোপকারী ও সুন্দর। শিশুদের প্রাকৃতিকভাবে বড়ো হওয়ার সুযোগ করে দিতে হবে। প্লে-ইংল্যান্ড নামের একটি সংগঠন বলেছে, শিশুদের গাছে ওঠা বা সাইকেল চালানোর মতো ঝুঁকিপূর্ণ খেলাগুলোয় উৎসাহিত করা উচিত। তাতে একটু-আধটু ব্যথা পেলে বা কেটে-ছিড়ে গেলেও ক্ষতি নেই। সে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে শিখবে। বাধা-বিপত্তি সম্পর্কে বুঝবে। আরো বুঝবে, যে-কোনো কিছু অর্জন করা অত সহজ নয়। সবকিছুই কষ্ট করে অর্জন করতে হয়। এতে তারা বুঝবে কষ্ট করে অর্জন করার মধ্যেই পাওয়া যায় পরিপূর্ণ তৃপ্তি ও অনাবিল আনন্দ। উন্নত দেশগুলোয় শিশুদের স্কুল এবং শিক্ষা পদ্ধতি আনন্দদায়ক। শিক্ষকরা বন্ধুসুলভ। সেখানে স্কুলে তাত্ত্বিক জ্ঞানের পাশাপাশি কোমলমতি শিক্ষার্থীদের 'প্রবলেম সলভিং স্কিল বা সমস্যা সমাধানের পারঙ্গমতা' শেখানো হয়। অনেক স্কুলের আঙিনায় বাচ্চাদের দিয়ে ফুল ও সবজির বাগান করানো হয়। সে বাগানের সবজি দিয়ে স্কুলে টিফিন খাওয়ানো হয়।

একটি সুস্থ, আধুনিক ও বাস্তবমুখী শিক্ষায় শিক্ষিত এবং উন্নত জাতি গঠনে আমাদের শিশুদের সঠিক উপায়ে প্রস্তুত করতে হবে। আর এ জন্য প্রয়োজন সমৃদ্ধ সোনালি শৈশব। শিশুদের উন্নত ভবিষ্যৎ গড়তে তাদের শৈশবকে দৃঢ় করতে হবে। এজন্য বাবা-মা, শিক্ষক, আত্মীয়-স্বজন সকলকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। শিশুদের সোনালি শৈশবকে রূপালি ভবিষ্যতে রূপান্তরিত করতে নিম্নলিখিত বিষয়ে সকলকে সচেতন হওয়া জরুরি।

- শিশুর সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলা। বাবা-মা সন্তানের সঙ্গে একান্ত কিছু সময় কাটানো। নিয়মিত সন্তানের খোঁজখবর নেওয়া। সন্তানের স্বপ্ন বা ইচ্ছের কথা জানা এবং তাদের উৎসাহ দেয়া;
- শিশুদের মাঝে মাঝে আত্মীয়-স্বজনের কাছে নিয়ে যাওয়া। স্বজনদের গুরুত্ব সম্পর্কে তাদের জানানো ও আলোচনা করা। সপ্তাহে অন্তত একদিন সপরিবারে কোথাও বেড়াতে যাওয়া যেমন বিনোদন পার্ক বা আত্মীয়ের বাড়ি;
- সাপ্তাহিক ছুটির দিনে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে একসঙ্গে খাওয়া, আড্ডা দেওয়া, নাটক, সিনেমা ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান দেখা;
- সন্তানদের দাদা-দাদি, নানা-নানির গল্প শুনানো। নিজেদের ছেলেবেলার গল্প শুনানো। গ্রামের বাড়ির গল্প শুনানো;

- বছরে অন্তত দু-একবার সাধ্যমতো ভ্রমণে যাওয়া, যেমন- বিভিন্ন দর্শনীয় ও ঐতিহাসিক স্থান এবং পর্যটন এলাকা, প্রাকৃতিক পরিবেশ ঘেরা মনোরম স্থান ইত্যাদি;
- আম-কাঁঠালের মৌসুমে, শীতের পিঠা-পায়েসের উৎসবে, ফসল তোলার মৌসুমে সন্তানদের নিয়ে গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে যাওয়া;
- সন্তানদের সাঁতার শেখানো, গাছে চড়া, সাইকেল চালাতে শেখানো, পাঠাগারে পাঠানো, গল্পের বই কিনে দেওয়া, বিশেষ দিবসে বই উপহার দেওয়া;
- সন্তানদের বহিরাঙ্গন কার্যক্রম যেমন খেলাধুলা, স্কাউটিং, বা সমাজসেবামূলক কাজে উৎসাহ দেয়া;
- শহরে অনুষ্ঠিত বইমেলা, পিঠামেলা, বৃক্ষমেলা, বর্ষা উৎসব, থিয়েটার নাটক ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানে নিয়ে যাওয়া;
- নানাবিধ শিল্পকর্ম যেমন চিত্রাঙ্কন, গান, কবিতা আবৃত্তি, নাটক ইত্যাদি বিষয়ে আগ্রহী করে তোলা;
- বিভিন্ন রকমের পশুপাখি, প্রাণীর প্রতি দয়া ও মমত্ববোধ সৃষ্টি করা;
- গরীব, দুঃখী ও দুস্থ মানুষের পাশে দাঁড়াতে উদ্বুদ্ধ করা;
- হাটে-বাজারে নিয়ে যাওয়া, বাজার করতে শেখানো; একা একা পথ চলা ও রাস্তা পার হতে শেখানো এবং ট্রাফিক নিয়ম মেনে চলা;
- সন্তানদের অন্যান্য সহপাঠী-প্রতিবেশী ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে মিশতে দেওয়া; তবে তারা কার সঙ্গে মিশে কী শিখছে সে বিষয়ে খেয়াল রাখা;
- সন্তানদের জীবনযাপন সম্পর্কে ধারণা দেওয়া। মূলত পারিবারিক আলোচনায় সন্তানদের সম্পৃক্ত করলেই এসব বিষয়ে ধারণা পাবে তারা;
- সন্তানদের আদর্শ ও আত্মনির্ভরশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা;
- সর্বোপরি আমরা অনেকেই পিতা-মাতা হিসেবে সন্তানদের কাছে আদর্শের মডেল হতে পারছি না। সবার আগে নিজেদেরকে আদর্শ নাগরিক ও ভালো মানুষ হিসেবে সন্তানের কাছে উপস্থাপন করতে হবে এবং সেমতে জীবনধারা পরিচালিত করতে হবে।

মোটকথা শিশুদের শৈশব আলোকিত করতে হবে। দিন-রাত সবসময় তাদের পাশে থাকতে হবে বন্ধুর মতো, তাহলেই আমরা গড়ে তুলতে পারব মর্যাদাশীল জাতি ও আধুনিক-উন্নত এবং একটি কল্যাণ রাষ্ট্র। ❑

তথ্যসূত্র:

https://www.protidinersangbad.com/editorial/103930

https://www.dailyjanakantha.com/opinion/news/755121

https://www.alokitobangladesh.com/print-edition/editorial/229710/%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF-%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A7%9C%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%9A%E0%A7%8D%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81-%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%B6%E0%A7%88%E0%A6%B6%E0%A6%AC

https://www.ittefaq.com.bd/222665/%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%A5%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%AB%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A6%9B%E0%A6%BF-%E0%A6%86%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A7%88%E0%A6%B6%E0%A6%AC

https://www.ittefaq.com.bd/624824/%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%B6%E0%A7%88%E0%A6%B6%E0%A6%AC-%C2%A0

পরিচালক, ডিএফপি, ঢাকা

শৈশবের সেই দুপুরটা



কুমার প্রীতীশ বল

কাগজ-কলম হাতে পেলে কারো নাকি ইচ্ছে হয় গল্প লিখতে, কারো ছড়া-কবিতা লিখতে। কেউ আবার নৌকা বানায়। ফুল, পাখি, ঘুড়ি। আমার তখন অন্যকিছু ইচ্ছে করে। ইচ্ছে করে অবন ঠাকুর হয়ে ছবি আঁকি। আমার এ ইচ্ছেপূরণে ঘরে-বাইরে সবাই সহযোগিতা করে। সবাই বলে, আমার নাকি ছবি আঁকার দারুণ হাত।

আমার তখন দশ বছর বয়স, আমি ক্লাস ফাইভে পড়ি। একদিন অবাক করার মতো একটা ঘটনা ঘটে।

বাবা বাতিঘর থেকে সন্দেশ পত্রিকা হাতে ছুটতে ছুটতে বাড়ি আসেন। আমার একটি ছবি নাকি ইউনেস্কো আয়োজিত আন্তর্জাতিক শিশু চিত্রাঙ্কণে প্রতিযোগিতায় পুরস্কৃত হয়েছে। সেই ছবি সত্যজিৎ রায় সম্পাদিত সন্দেশ পত্রিকায় ছাপাও হয়েছে। কী আশ্চর্য, ইনসেটে আমার ছবিও আছে! কী একটা অবস্থা!

পত্রিকা হাতে পেয়ে বাবাকে প্রশ্ন করি, 'বাবা, সত্যজিৎ রায় আমার ছবিটা কীভাবে পেলেন?'

হাসতে হাসতে বাবা জবাব দিলেন, 'জানি না। হয়ত জাদুমন্ত্র দিয়ে এনেছেন।'

আমি বাবার কথা বিশ্বাস করে বললাম, 'আচ্ছা, সত্যজিৎ রায় জাদুও জানেন বুঝি?'

সত্যজিৎ রায় সিনেমা বানান। গল্প লেখেন এবং সন্দেশ পত্রিকার সম্পাদক। বাড়িতে 'সেরা সন্দেশ'সহ সত্যজিৎ রায়ের অনেক বই আছে। তাই আমি এসব জানি। কিন্তু জাদু জানেন? এটা তো কোথাও পড়িনি। এমন কথা যখন ভাবছিলাম,

বাবা বললেন,'হয়ত জাদুকর জুয়েল আইচের সহায়তা নিয়েছেন।'

বাবার দুষ্টুমি ভরা হাসিহাসি মুখ দেখে মা ইশারা করল। বললেন, 'এটা সত্যি না।'

সত্যিটা যে কী তাও কিন্তু মা বলল না। তাই মনে হলো, এটা নিশ্চয়ই বাবার কাজ। বাবাই ছবিটা আমাকে না জানিয়ে পাঠিয়েছেন, আমাকে সারপ্রাইজ দেবে বলে। বিষয়টা নিশ্চিত হওয়ার জন্য বাবাকে নানাভাবে প্রশ্ন করি।

না, সত্যিই বাবা পাঠাননি। পরে জেনেছি। সত্যজিৎ রায় ছিলেন বিচারকদের একজন। ছবিটা তাঁর পছন্দ হওয়ায় কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে সন্দেশ পত্রিকায় ছেপেছেন।

ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই বাড়িতে একটা চিঠি আসে। গোটা গোটা অক্ষরে খামের উপর আমার নাম। দেখেই আরেকবার অবাক হওয়ার পালা। প্রথ মবারের মতো এমন ঘটনা ঘটল। এসেছে সত্যজিৎ রায় সম্পাদিত সন্দেশ পত্রিকা অফিস থেকে। খামের উপর সত্যজিৎ রায়ের ভুবনমোহিনী দস্তখত। ওমা, এ কী কাণ্ড! ভেতরটা ফাঁকা! কোনো চিঠি নেই। খাম খুলে আরও বেশি অবাক হলাম। এটা কী হলো? এটাকে আরেকটি বিস্ময়কর ঘটনা মনে হলো। এ নিয়ে ভাবতে ভাবতেই সন্দেশ পত্রিকা অফিস থেকে আরেকটি চিঠি আসে। এবার আর খালি খাম না। চিঠি আছে। সত্যজিৎ রায় লিখেছেন, 'কুশল, তোমার সঙ্গে একবার দেখা করা প্রয়োজন- অবিলম্বে। এই চিঠিটা তোমাকে লিখেছিলাম, কিন্তু ভুল করে খামে ভরিনি। তাই এখন পাঠিয়ে দিলাম।'

সত্যজিৎ রায় বাবাকেও একটা চিঠি লিখেছেন। ওখানে লিখেছেন, 'কুশলের আশ্চর্য প্রতিভার সদ্ব্যবহার করা দরকার। যদি সম্ভব হয়, ওকে একবার আমার কাছে নিয়ে আসেন।'

উনি আছেন কলকাতা। আমরা বাংলাদেশে। বললেই কি যাওয়া যায়?

ঈদের ছুটিতে বাবা আমাদের নিয়ে কলকাতা গেলেন। ভিক্টোরিয়া পার্ক, শান্তিনিকেতন, চিড়িয়াখানা অনেক জায়গায় গেলাম। এরমধ্যে একদিন সত্যজিৎ রায়ের বাড়ি গেলাম। সৌম্য, শান্ত, বিশালদেহী মানুষটি সাদা পাঞ্জাবি পাজামা পড়ে বসে আছেন। বাবা-মা'র দেখাদেখি আমিও তাঁর পা ছুঁয়ে সালাম করলাম। বাংলাদেশ থেকে সত্যি সত্যিই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছি। শুনে অবাক হলেন। খুশিও হলেন।

বললেন,'তুমিই তাহলে কুশল।'

আমি হেসে মাথা নাড়লাম। অনেক কথা বললেন। শুনলাম তাঁর ছেলেবেলার কথা, ছবি আঁকার কথা। কী চমৎকারভাবে তিনি বললেন, 'বড়োরা বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা বলতে যা বোঝান, সেসব কিছুই জানতাম না। এমনকি কলেজেও এ ব্যাপারে সচেতন ছিলাম না। শান্তিনিকেতন আমার চোখ খুলে দিল। আমাকে বদলে দিল। জানো কুশল, আমি জানি না, পথের পাঁচালী সিনেমা করা আমার পক্ষে সম্ভব হতো কিনা; যদি না, আমি শান্তিনিকেতনের ছাত্র না হতাম। শান্তিনিকেতন আমার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিল। মাস্টারমশাই নন্দলাল বসুর পায়ের তলায় বসে আমি শিখেছি, প্রকৃতিকে কী করে দেখতে হয়। শিখেছি কী করে প্রকৃতিকে উপভোগ করতে হয়। কী করে প্রকৃতির ভিতরের ছন্দকে অনুভব করতে হয়। কুশল, আমার স্বীকার করতে এতটুকুও দ্বিধা নেই, আজ আমি যা হয়েছি তা হতে পারতাম না, যদি মাস্টারমশাইয়ের পায়ের তলায় বসে সেদিন সে পাঠ গ্রহণ না করতাম।'

সত্যজিৎ রায় শিক্ষকদের সম্মানের কথাটা তখন বারবার বলছিলেন।

বাবা আমাকে ফিসফিস করে বললেন, 'বুঝেছিস, বড়ো হতে হলে কত বিনয়ী হতে হয়।'

সত্যজিৎ রায়ের মোটিভেশনাল স্পিচটা আমাকে ছবি আঁকার জন্যে আরও বেশি উৎসাহিত করল। আমি সঙ্গে নিয়ে যাওয়া কয়েকটি ছবি তাঁর হাতে তুলে দিলাম। তারপর তাঁর পা ছুঁয়ে আবারও সালাম করলাম। আমরা যখন বের হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছি, তখন তিনি ডেকে বললেন, 'একটু অপেক্ষা করো কুশল।'

তিনি সন্দেশের কয়েকটা সংখ্যা স্বাক্ষর করে আমার হাতে দিলেন। আমি পত্রিকাগুলো নিয়ে সালাম



করতে চাইলে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। তারপর মাথায় একটা চুমো খেলেন।

আমি বললাম, 'আমি সন্দেশ পড়ি। আমার কাছে 'সেরা সন্দেশ' বইটা আছে।'

সত্যজিৎ রায় ভ্রু কুচকে প্রশ্ন করলেন, 'বাংলাদেশে সন্দেশ যায়?'

বাবা বললেন, 'যায়। তবে নিয়মিত না।'

সত্যজিৎ রায় বললেন, 'ঠিকানা লিখে দাও। আমি পোস্টে নিয়মিত তোমার জন্য সন্দেশ পাঠাবো।'

বাবা আমাদের ঠিকানা লিখে দিল।

আমি বললাম, ' সেরা সন্দেশের অনেক ছড়া, কবিতা আমার মুখস্ত।'

সত্যজিৎ রায় বললেন, 'তাই নাকি! ভেরি গুড। ভেরি গুড। শোনাও দেখি।'

আমি সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে গেলাম। একটু গলা খাঁকিয়ে তারপর বললাম, 'নমস্কার। আমি অন্নদা শংকর রায়ের 'নাই মামা আর কানা মামা' আবৃত্তি করছি। এসময় সত্যজিৎ রায় একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন। আবৃত্তি শেষ হওয়ার ক্ষাণিকক্ষণ পর বললেন, 'আর একটা...আর একটা হবে।'

আমি তাঁরই 'জবর খাকি' আবৃত্তি করলাম। এরপর তাঁর আর বলা লাগেনি। এমনিতেই আবৃত্তি করলাম, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'খেলা দেখে যান'।

এসময় এখানে বসলেন সত্যজিৎ রায়ের স্ত্রী বিজয়া রায়, ছেলে সন্দীপ রায়। আমি যখন আবৃত্তি করছিলাম, তখন তাঁকে কেমন জানি মনে হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, তিনি আমার মধ্যে কী যেন খুঁজছিলেন। আবৃত্তি শেষ হলে সত্যজিৎ রায় স্ত্রী-পুত্রের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। বললেন, 'ওরা বাংলাদেশ থেকে এসেছে। ওর নাম কুশল। ওর ছবি সন্দেশে ছাপা হয়েছে।'

চা-নাশতা শেষ করে আমরা যখন বিদায় নিলাম, তখন সূর্য অস্তগামী প্রায়। আমাদের জন্য নির্ধারিত সময় ছিল দশ মিনিট। বেরুবার পর বাবা বললেন, 'দশ মিনিট তো শেষ হয়েছে অনেক আগে। এখন প্রায় দু'ঘণ্টা হলো।'

মা বললেন, 'তারপরও তো ছাড়তে চাননি।'

বাবা বললেন, 'কুশলকে বোধহয় ওনার খুব পছন্দ হয়েছে।'

সত্যজিৎ রায় গেইট পর্যন্ত আমাদের এগিয়ে দিলেন। আমরা গাড়িতে উঠব, তখন তিনি বললেন, 'কুশল আবার এসো কিন্তু। কলকাতা আসলে আমাকে দেখে যাবে।'

আমি মাথা নেড়ে সম্মতি জানালাম।

এরপর হঠাৎ মা'র ডাকাডাকির শব্দ কানে এসে লাগল। মা বলছেন, 'কুশল, ওঠ। কীসব বিড়বিড় করছিস? টেলিভিশনে 'পথের পাঁচালী' শুরু হয়ে গেল যে। দেখবি না?'

মায়ের ডাকে ঘুমটা ভেঙে গেল। আমি মা'র মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকি। তখনও স্বপ্নের ঘোর কাটেনি। আমার বুকের উপর আধখোলা অবস্থায় 'সেরা সন্দেশ' বইটা আছে। ঘুমানোর আগে ওটা পড়ছিলাম। মা বুকের উপর থেকে বইটা নিয়ে একপাশে রাখলেন। আমি সেদিকটায় তাকালাম। ওদিকটায় আমার ছবি আঁকার কাগজ, রং-পেনসিল, রং-তুলি ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।

মা'র উপর রাগই হলো। না ডাকলে হয়ত আরও ক্ষাণিক সময় সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে থাকতে পারতাম। হয়ত আরও কিছু পেতাম। আরও কিছুক্ষণ যদি ঘুমাতে পারতাম। মা ব্যপারটা বুঝতে পারেন। তাই বললেন, 'কুশল, তুই স্বপ্ন দেখছিলি? দিবাস্বপ্ন নিষ্ফল হয়। তুই জানিস না?'

তারপরও... শৈশবের সেই দুপুরটার কথা মনে হলে এখনও আমার করোটিতে শিহরণ জাগে। ❑

কথাসাহিত্যিক, নাট্যকার

আমায় দাও ফিরিয়ে

মাহমুদা সিদ্দিকা

শৈশব আমায় দাও ফিরিয়ে
একটি বারের জন্য
কিচিরমিচির পাখির দলে
হব আমি গণ্য।

শৈশব আমায় দাও ফিরিয়ে
হাঁটতে যাব মাঠে
সকালবেলা মনটা দেবো
বাংলা গণিত পাঠে।

শৈশব আমায় দাও ফিরিয়ে
বিদ্যালয়ে যাব
বাবার থেকে টাকা নিয়ে
টিফিন কিনে খাব।

শৈশব আমায় দাও ফিরিয়ে
খেলব চড়ুইভাতি
মুঠো ভরে ধরব জোনাক
হবে যখন রাতি।

খেলনার রাজ্য

সাদেকুল ইসলাম সাদেক

ভাঙা পুতুল, কাঠের ঘোড়া,
ছিল রাজ্যের ধন।
দামি জিনিস জানতাম না,
খেলনাই ছিল আপন।

খেলনার সাথে কথা বলতাম,
খেলনাই ছিল সকল সুখ
কোনো খেলনা হারিয়ে গেলে,
কেঁদে ভাসাতাম বুক।

খেলনার রাজ্য হারিয়ে গেছে,
সময়ের দোষে
তবু মনে রাজা আমি,
স্মৃতির কোষে।

শৈশব স্মৃতি

হাফিয রেদওয়ান

শৈশবকালে পাখি ধরতে
দিতাম না আর ছাড়
পাখির পিছু ছুটে ছুটে
সন্ধ্যা হতো পার।

টিয়ে ঘুঘু দোয়েল শালিক
যেথায় তাদের বাড়ি
খুঁজে খুঁজে যেতাম আমি
বন দিয়ে ভাই পাড়ি।

গাছের ডালে টিয়ের বাসায়
ডিম যে আছে তাতে
ডিম ধরতে চেঁচা-চেঁচি
ঠোকর দেয় তাই হাতে।

একদিন এক মা পাখিটা
করুণ সুরে কাঁদে
কাছে গিয়ে দেখি আমি
ঘুঘুর ছানা ফাঁদে।।

মনে অনেক দয়া হলো
ছেড়ে দিলাম দূরে
পত পত পত ডানা মেলে
মুক্তাকাশে ওড়ে।





দাদার শৈশব

আব্দুস সালাম

কুষ্টিয়ার ব্যস্ত শহরে একটি বহুতল ভবনের ফ্ল্যাটে থাকেন আকবর হোসেন। ছেলে ও ছেলের বউ দুজনেই চাকরিজীবী। সকালে বেরিয়ে যান, ফিরতে ফিরতে রাত। বাসায় সারাদিন থাকেন আকবর হোসেন আর তার ছোট্ট নাতি আখতার নেহাল।

তাদের ফ্ল্যাটের জানালা থেকে দেখা যায় এক বিশাল সবুজ মাঠ। সকাল-বিকাল সেখানে শিশু-কিশোররা হইহল্লা করে খেলাধুলা করে। কেউ ক্রিকেট ব্যাট ঘোরায়, কেউ ফুটবলে ছুটে যায়, কেউ আবার স্রেফ দৌড়ঝাঁপ করে হাসিতে মাতিয়ে তোলে মাঠটিকে।

আকবর হোসেন প্রতিদিন জানালার গ্রিল ধরে চুপচাপ সেই দৃশ্য দেখতে থাকেন। পাশে এসে বসে নেহাল। কখনো চুপ, কখনো গল্পে মেতে ওঠে।

একদিন নেহাল আবদার করে বলল,

'দাদা, তুমি তো বলো যে তোমাদের শৈশব ছিল খুব মধুর। কেমন কাটত তোমাদের সময়? আমি জানতে চাই।' দাদার চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল। তিনি যেন এক লহমায় ফিরে গেলেন পঞ্চাশ-ষাট বছর আগের গ্রামে।

'শোনো নেহাল, আমাদের পাড়ায় তখন সমবয়সি অনেক বন্ধু ছিল। বিকেল হলেই আমরা ছুটতাম স্কুল মাঠে। খেলতাম ডাংগুলি, গোল্লাছুট, কানামাছি, দাঁড়িয়াবান্ধা, লাঠিখেলা, মার্বেল, কাবাডি– কত কী যে খেলেছি!'

নেহালের চোখ বড়ো হয়ে গেল।

'দাদা, ওইসব খেলা কেমন করে খেলতে হয়? তুমি আমাকে শিখিয়ে দাও না।'

দাদা ধৈর্য নিয়ে কয়েকটা খেলার নিয়ম বোঝাতে লাগলেন। নেহাল মুগ্ধ হয়ে শুনল। যেন কল্পনায় দেখতে পেল, গ্রামের মাঠে দৌড়ে বেড়াচ্ছে দাদার ছেলেবেলা।

দাদা বললেন–

'ডাংগুলিতে একটা ছোটো কাঠকে লাঠি দিয়ে আঘাত করে যত দূরে পাঠানো যায়, সেটাই ছিল আসল আনন্দ। গোল্লাছুটে সবাই দৌড় দিত, কে আগে পার হয় সেটাই ছিল মজা। কানামাছিতে একজনের চোখ বেঁধে দেওয়া হতো, সে অন্ধের মতো হাতড়ে হাতড়ে সবাইকে ধরতে যেত। দাঁড়িয়াবান্ধায় মাটিতে দাগ টেনে রাখা হতো, সবাই সেটি পার হওয়ার চেষ্টা করত।

লাঠিখেলায় আমরা লম্বা লাঠি ঘুরিয়ে খেলতাম। এতে শরীর মজবুত আর মন খুশি থাকত। মার্বেল খেলায় তো আমার জুড়ি ছিল না। আমি এত ভালো খেলতাম যে একবার একশরও বেশি মার্বেল জিতে ফেলেছিলাম!'

নেহাল বিস্ময়ে দাদার দিকে তাকিয়ে থাকল। যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে মাঠ ভরা হাসিখুশি ছেলেদের দৌড়ঝাঁপ আর দাদার জয়ী হাসি।

দাদা আবার বললেন–

'আমাদের গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে কাজলা নদী। বর্ষাকালে আমরা কত সাঁতার কেটেছি সেখানে! নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে ওপারে গেছি, আবার ফিরে এসেছি। মাছ ধরেছি, তালগাছ কেটে ডিঙ্গি বানিয়েছি, সেই ডিঙ্গিতে বসে মাছ ধরেছি। মা মাছগুলো রান্না করলে আহা, কী স্বাদই না লাগত!'

নেহাল হেসে বলল–

'দাদা, আপনাদের সর্দি-কাশি লাগত না? এত ভিজতেন পানিতে!'

দাদা হেসে মাথা নেড়ে বললেন–

'না রে, আমাদের কিছুই হতো না। শরীর ছিল শক্ত, মন ছিল আনন্দে ভরা।'

নেহালের মুখ গম্ভীর হয়ে গেল।

'দাদা, আমি তো সাঁতারই জানি না। শিখতে চাই।'

দাদা মাথায় হাত রেখে বললেন–

'চিন্তা করিস না। এবার ছুটিতে তোকে গ্রামে নিয়ে যাব। আমি নিজেই তোকে সাঁতার শিখিয়ে দেব।'

দাদা আবার বলতে লাগলেন–

'বৃষ্টির দিনে ফুটবল খেলাটা ছিল সবচেয়ে মজার। বল পানিতে আটকে যেত, আমরা বলে কিক দিতে কাহিল হয়ে পড়তাম। কেউ আবার হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ত। কখনো কচুর পাতা মাথায় দিয়ে বৃষ্টিতে দৌড়াতাম। আমের আঁটি দিয়ে বাঁশি বানিয়ে ফুঁ দিতাম, কী সুন্দর সুর বের হতো!'

দাদা স্মিত হেসে বললেন–

'শীতকালে আমরা বাবার আনা খেজুরের রস খেতাম। মা বানাতেন পাটিসাপটা, ভাপা পিঠা। গরম খেজুরের গুড়ের গন্ধে গোটা বাড়ি ভরে যেত। রাতে লেপ মুড়ি দিয়ে ভাইবোনেরা একসাথে গল্প করতে করতে ঘুমিয়ে পড়তাম।'

নেহাল চোখ মুদে কল্পনায় সেই পিঠার গন্ধ টের পেল যেন।

দাদা আবার উচ্ছ্বাসে বললেন–

'আমরা লাল-নীল কত রঙের ঘুড়ি বানাতাম! লম্বা লেজ লাগিয়ে আকাশে তুলতাম। কারো ঘুড়ি কেটে

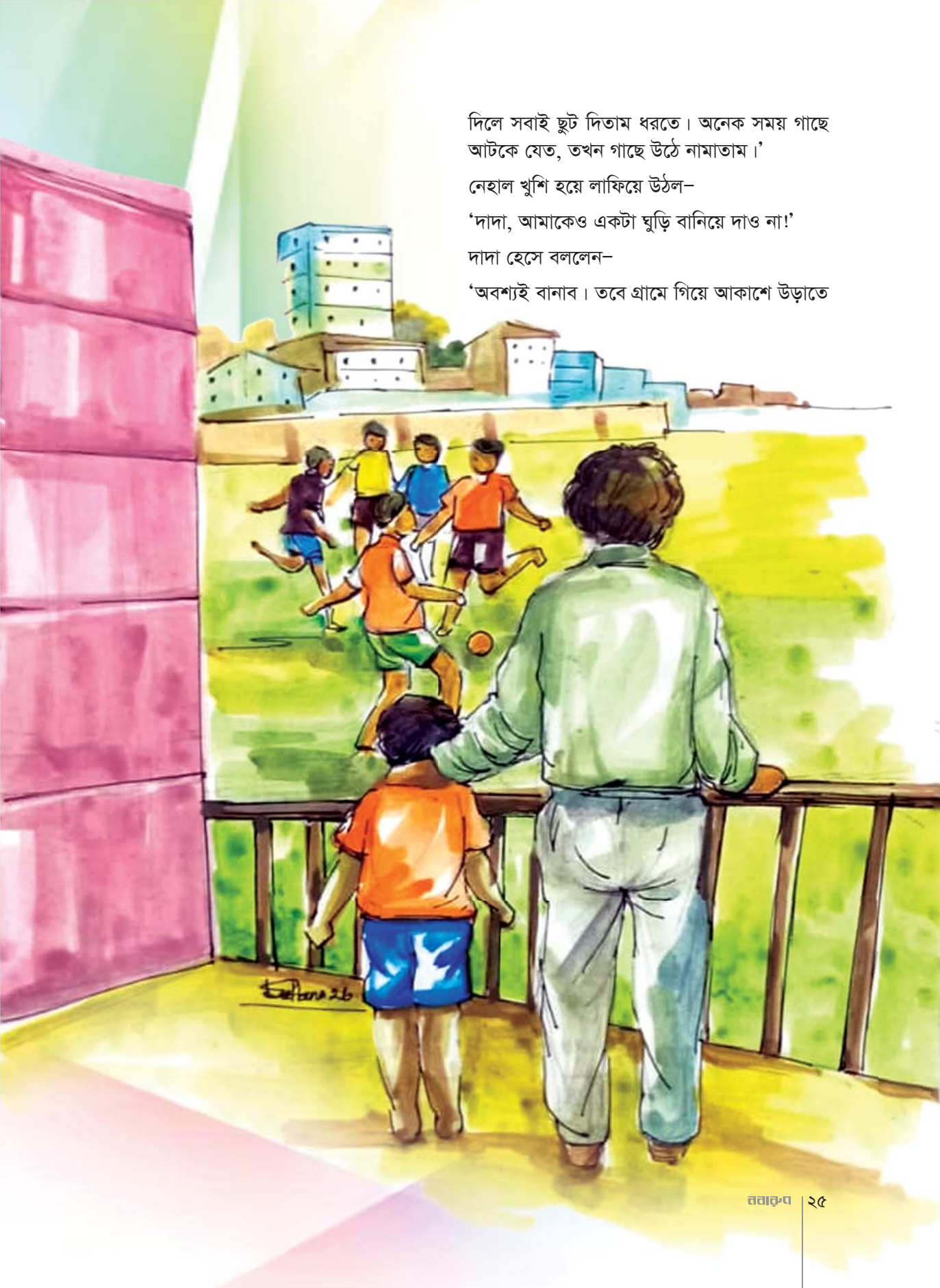

দিলে সবাই ছুট দিতাম ধরতে। অনেক সময় গাছে আটকে যেত, তখন গাছে উঠে নামাতাম।'

নেহাল খুশি হয়ে লাফিয়ে উঠল–

'দাদা, আমাকেও একটা ঘুড়ি বানিয়ে দাও না!'

দাদা হেসে বললেন–

'অবশ্যই বানাব। তবে গ্রামে গিয়ে আকাশে উড়াতে

হবে।'

তারপর দাদা একটু থেমে বললেন–

'আমাদের বাড়ির শেষে ছিল বাঁশঝাড়। সেখানে রাতের বেলা কত জোনাকি জ্বলজ্বল করত। একদিন আমরা জোনাকি ধরতে গিয়েছিলাম, হঠাৎ অন্ধকারে খুব ভয় পেয়েছিলাম। তখন থেকে শিখেছিলাম অন্ধকার জায়গায় সাবধানে যেতে হয়।'

নেহাল গম্ভীর মুখে মাথা নাড়ল।

দাদা বললেন–

'আমাদের গ্রামে একটা দিঘি ছিল। তার নাম কাজলাদিঘি। বিকেলবেলায় দিঘির পাড়ে বসে বাতাস খেতাম। এখন সেই দিঘি ভরাট হয়ে গেছে। কত কিছুই হারিয়ে গেছে।'

দাদা যখন জানালার পাশে দাঁড়িয়ে একের পর এক গল্প বলছিলেন, তখন নেহালের চোখ ভিজে গেল। সে বলল–

'দাদা, তোমাদের শৈশব কত সুন্দর ছিল! আমারও যদি এমন একটা শৈশব থাকত!'

দাদা নেহালকে বুকে টেনে নিলেন। মমতার সুরে বললেন–

'দাদু ভাই রে, সময় বদলেছে। তোমাদের শৈশবও ভীষণ সুন্দর। এখন তোমরা বই পড়ে, টিভি আর কম্পিউটারে দেখে দুনিয়ার নানা জায়গা চিনতে পারো। আমরা কিন্তু তখন তা পারতাম না। তবে খেলাধুলার মজা ভুলিস না। আমি তোকে গ্রামে নিয়ে যাবো। সেখানে সাঁতার শেখাবো, আকাশে ঘুড়ি ওড়াতে শেখাবো, আর রাতের আকাশে তারা গুনব।'

নেহালের চোখ-মুখ আনন্দে জ্বলে উঠল। সে মনে মনে স্বপ্ন দেখতে শুরু করল পরীক্ষা শেষ হলে দাদার সঙ্গে গ্রামে যাবে, নদীতে সাঁতার কাটবে, আকাশে ঘুড়ি উড়াবে, দাদার শৈশবের মতো মজা করে কয়েকটা দিন কাটাবে। ❑

সহকারী সচিব, নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

শৈশবের স্কুল

নাওয়ার আলম

স্কুল ঘণ্টার টুংটাং সুর
ব্যাগ ভরা বই, মনটা দূর
বন্ধুদের সাথে দৌড়ঝাঁপ
পড়ালেখায় নেই চাপ।

খাতার পাতায় আঁকি ছবি
শিক্ষকের কথা শুনে কাঁপি
ব্ল্যাকবোর্ডে লেখা অক্ষর
ভবিষ্যতের প্রথম স্বাক্ষর।

ছুটির ঘণ্টা বাজল যেই
সবাই ছুটে যায় ধেই ধেই
স্কুল মাঠে হাসির ঢেউ
শৈশব ভুলে না কেউ।

দশম শ্রেণি, জিলা স্কুল, ময়মনসিংহ



শ্রাবণের সওদাগর

চন্দনকৃষ্ণ পাল

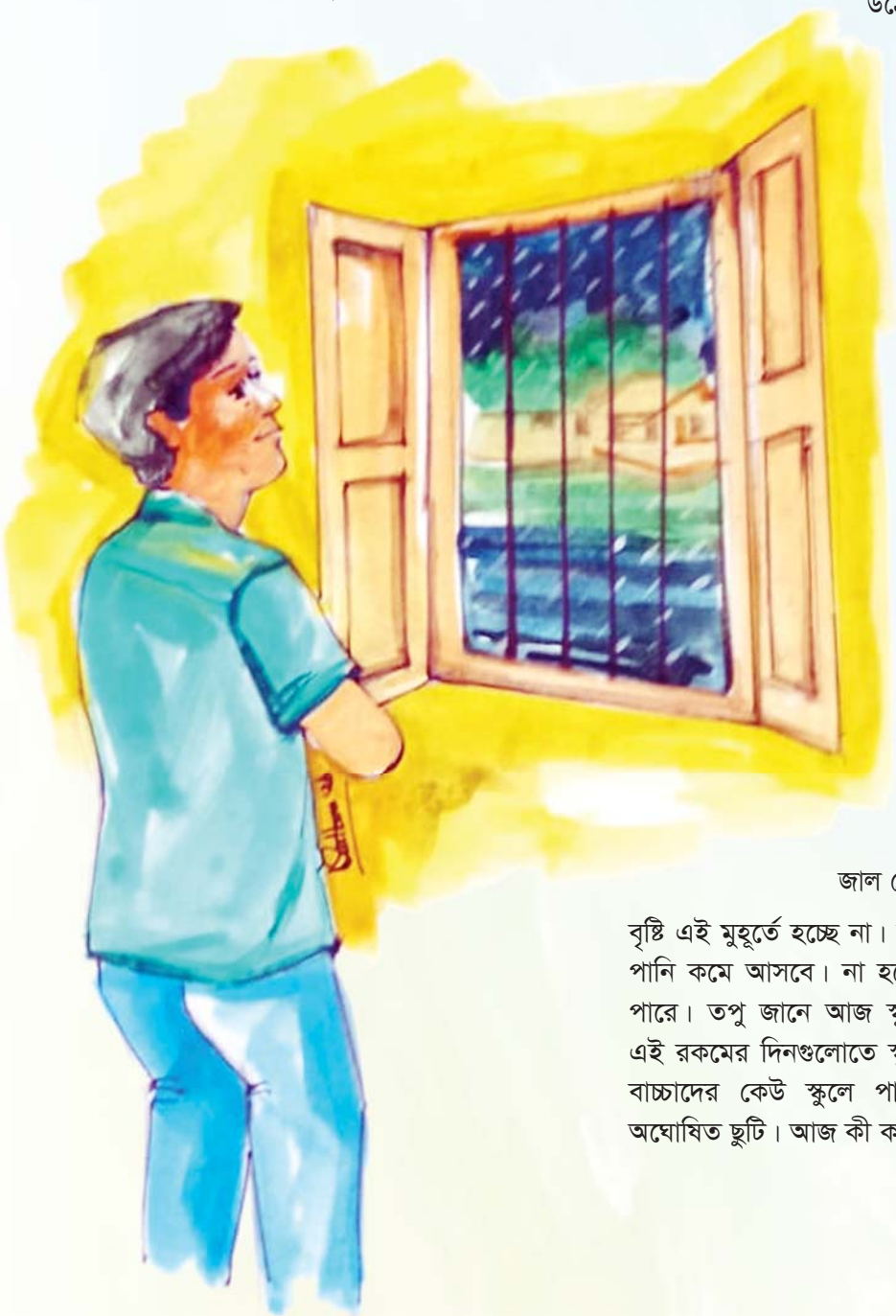

গত দু-দিন ধরে অঝোরে বৃষ্টি হচ্ছে শ্রীমঙ্গলে। আজ সকালে ঘুম ভেঙে জানালার বাইরে তাকাতেই অবাক হয় তপু। তাদের বাড়ির দক্ষিণের মাঠ জুড়ে ঘোলা পানির ঢেউ। মানে বান নেমেছে। শ্রীমঙ্গলে প্রতি বছরই এমন হয়। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বেড়ে গেলেই পাহাড় থেকে নেমে আসা পানি ফুলছড়ার বুক উপচে পুরো এলাকার মাঠ বেয়ে হাইল হাওরের পানে ছুটতে থাকে। মাঠঘাট টইটম্বুর হয়ে কখনো কখনো উঠোনেও চলে আসে পানি। খুব বাড়াবাড়ি না হলে ঘরে ওঠে না পানি। কারণ এলাকার প্রায় সবার ঘরের ভিটা একটু উঁচুতে করা হয়। চোখে-মুখে পানি দিয়ে, মুখটা মুছে আবার জানালায় বসে ও। দূরের মাঠের দিকে তাকায়। কত কিছু ভেসে যাচ্ছে পানিতে। কচুরিপানা তো আছেই সাথে পুরনো গাছের গুড়ি। গোপাটে (গরু চলাচলের রাস্তা) কলি কাকা ঠেলা জাল পেতেছেন। মাঝে মাঝে মাছ রাখছেন কোমরে বাঁধা খালুইতে। মাঠের মাঝেও অনেকে ঠেলা জাল পেতেছে।

বৃষ্টি এই মুহূর্তে হচ্ছে না। বৃষ্টি না হলে ধীরে ধীরে পানি কমে আসবে। না হলে পানি আরো বাড়তে পারে। তপু জানে আজ স্কুল হবে না। শ্রীমঙ্গলে এই রকমের দিনগুলোতে স্কুল খোলা থাকলেও বাচ্চাদের কেউ স্কুলে পাঠায় না। আজ তপুর অঘোষিত ছুটি। আজ কী করবে তপু?

ভাবনায় হারিয়ে গিয়েছিল তপু। হঠাৎ কারো ডাকে ওর চমক ভাঙল।

: কী রে তপু কী করিস?

বিশাল একটি মানকচুর পাতা মাথায় ধরে জানালায় এসে দাঁড়িয়েছে অনু।

: না কিছু না। ভাবছি কী করব আজ। স্কুলে তো যাওয়া যাবে না।

: চল মাছ ধরতে যাই।

: না, মা যেতে দিবেন না। জলে দাঁড়িয়ে মাছ ধরলে ঠান্ডা লেগে যেতে পারে।

: তাহলে তুই চিন্তা কর। আমি একটু ঘুরে আসি।

অনু নিরুদের বাড়ির দিকে চলে যায়। খুব দ্রুতই তপুর মাথায় চিন্তাটা খেলে যায়। আজ তপু জাহাজ বানাবে। কালই দু-তিনটা কলাগাছ কাটা হয়েছে। কলা পাতার মাঝখানের ডগাকে সুন্দর করে কেটে বাঁশের কাঠিতে গেঁথে নিয়ে জাহাজ বানাতে হবে। মনটা আনন্দে ভরে ওঠে তপুর। ড্রয়ার থেকে আম কাটার ছুরিটা নিয়ে কলাবনের দিকে আগায় তপু। হালকা বৃষ্টি হচ্ছে। ও গরু ঘরের বেড়ায় ঝুলানো মাথাল থেকে একটা মাথাল মাথায় পরে নেয়। মাটিতে শুয়ে থাকা কলাগাছের অনেকগুলো পাতা কেটে গরু ঘরের খোলা জায়গায় নিয়ে আসে তপু। কলা পাতার গন্ধ পেয়ে গরুগুলো ফোঁস ফোঁস করছে। একজন তো ডাকই ছাড়ল-'হাম্বা' অর্থাৎ পাতাগুলো আমাদের দাও, খাই। ডগা থেকে পাতা ছাড়িয়ে পাতাগুলো গরুর সামনে রাখে তপু। ওরা খুশিমনে পাতা খেতে শুরু করে।

তপু সুন্দর করে সাইজমতো ডগাগুলো কেটে নেয়। ঝাড়ু বানানোর জন্য চিকন করে কেটে রাখা বাঁশের শলা থেকে কয়েকটা শলা নিয়ে ডগাগুলোকে গেঁথে চমৎকার একটি জাহাজের অবয়ব তৈরি করে তপু। কয়েকটা আগা সাজিয়ে পাশের ওয়ালও তৈরির করে। তারপর মোটা পলিথিনের পুরনো শীট কেটে ছাউনি দেয়। এবার জাহাজের কাজ শেষ। পুরনো সুতলির বান্ডিল থেকে পিছনে সুতলি বেঁধে দিলেই কেল্লাফতে। বৃষ্টি একদমই থেমে গেছে। অনু ফিরে এসেছে নিরুকে নিয়ে।

: জাহাজ বানিয়েছি দেখ।

: দারুণ তো। কোথায় ভাসাবি?

: আমাদের সাঁকো থেকে ছাড়ব। তুই আর নিরু ঠাকুর বাড়ির সাঁকোতে থাকবি। ওখানে মাল বোঝাই করে দিবি। আমি আমাদের সাঁকোতে মাল আনলোড করব।

: একদম। তাহলে চল।

আনন্দে হাততালি দেয় অনু আর নিরু।

তিনজনে মিলে তপুদের বাঁশের সাঁকোতে চলে আসে। সাঁকোর নীচ দিয়ে বয়ে যাওয়া ঘোলা পানির স্রোত।

: সুন্দর করে লোড করিস অনু। দেখিস জাহাজ না আবার ডুবে যায়।

: চিন্তা করিস না। ঠিকঠাক লোড দিবো।

অনু আর নিরু তপুকে রেখে ঠাকুর বাড়ির সাঁকোতে চলে যায়।

তপু জাহাজ ভাসায় সাঁকোর নিচের জলে। তারপর আস্তে আস্তে সুতলি ছাড়তে থাকে। জাহাজ ভাটির পানে যাত্রা শুরু করে।

ঠাকুর বাড়ির সাঁকোতে পৌঁছে যায় জাহাজ। অনু জাহাজ আটকায় তারপর সাঁকোর বাঁশের সাথে জাহাজ বেঁধে রাখে। পাশের বাঁশঝাড়ের নিচে ভাটঝোঁপের পাশে শুকনো কেঁচোর তোলা মাটি হচ্ছে তনুদের ব্যাবসার মালামাল। মাটিগুলো ভাটপাতায় ঢেকে জাহাজ লোড করে ওরা। জাহাজে লাগানো সুতলিটা পিছন থেকে খুলে সামনের কাঠিতে বেঁধে দেয় অনু। তারপর তপুর উদ্দেশ্যে আওয়াজ দেয়-

: তপু লোড শেষ। এবার টান দে।

: দিচ্ছি।

তপু সুতলি গুটাতে শুরু করে। জাহাজ স্রোতের উজানে এগোতে থাকে। দারুণ আনন্দে মন ভরে

যায় তিন কিশোরের। মনসামঙ্গলের চাঁদ সওদাগরের কথা মনে পড়ে যায় তাদের। তনুদের সাঁকোর কাছাকাছি পৌঁছে যায় জাহাজ। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই মালামাল খালাস শুরু হবে। শ্রাবণের সওদাগর তপুর মনে হয় একদিন ও বড়ো ব্যাবসায়ী হবে। ভালো ব্যাবসায়ী হবে চাঁদ সওদাগরের মতো দেশ-বিদেশ থেকে নানান মালামাল এনে দেশের চাহিদা মেটাবে তপু। জাহাজের দড়িটা দ্রুত হাতে সাঁকোর খুঁটির সাথে বেঁধে ফেলে তপু। এবার মালামাল খালাসের পালা।

সাবেক পরিচালক, বাংলাদেশ পল্লি বিদ্যুতায়ন বোর্ড, ঢাকা



আনন্দের দিনগুলো

ইয়াসমিন আকতার



ইতু জিতু আর মিতু তিন বন্ধু। একসাথে মাঠে খেলতে যায়। আজ ওরা ভীষণ খুশি। ইতু একটি বেলুন এনেছে। সেটা নাকি উড়তে পারে!

তিনবন্ধু গোল হয়ে দাঁড়াল। তারপর বেলুনের সুতো ধরে বেলুনটা ছেড়ে দিলো।

বেলুনটা আস্তে আস্তে উপরে উঠতে থাকে।

ইতু জিতু আর মিতু ঝুলতে থাকে। ওদের হাতে বেলুনের সুতো। বেলুন উড়তে থাকে। তিনবন্ধু ঝুলতে থাকে।

উড়তে উড়তে বেলুন অনেক উপরে উঠে গেল।

একঝাঁক পাখি উড়ছিল। ইতু জিতু আর মিতু পাখি দেখে ভীষণ খুশি হলো।

পাখির ঝাঁক বলল, বন্ধুরা, তোমাদের স্বাগত। চলো, আমরাও তোমাদের সাথে উড়ব।

জিতু বলল, তাহলে তো খুব ভালো হয়। এসো এসো।

পাখির ঝাঁক উড়তে লাগল। উড়তে উড়তে ওদের সাথে এল কিছুদূর। তারপর এক সময় বিদায় নিয়ে চলে গেল।

বেলুন উড়তে থাকে। ইতু জিতু আর মিতু ঝুলতে থাকে।

মেঘের সাথে দেখা হলো। সাদা মেঘ। কালো মেঘ। একদল পিচ্চি মেঘ নেচে নেচে খেলছিল। ইতু জিতু আর মিতু মেঘ দেখে খুব খুশি হলো। বাচ্চা মেঘগুলো কেমন গায়ের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে!

মেঘদল বলল, আমাদের জগতে তোমাদের স্বাগত। এসো, আমরা একসাথে খেলি।

মেঘের সঙ্গে ওরা অনেক মাখামাখি করল।

ইতু বলল, এবার আসি বন্ধু। আমাদের অনেক দূরে যেতে হবে।

বেলুন উড়তে থাকে। ইতু জিতু আর মিতু ঝুলতে থাকে।

একসময় ওরা খুব গরম অনুভব করল। সূর্যের তাপে ওরা ঘেমে একাকার। মনে হচ্ছে আর একটু গেলেই সূর্যকে ছুঁয়ে ফেলবে!

না, না, আর উপরে যাওয়া যাবে না। বেলুন বন্ধু, এবার একটু থামো। এবার একটু জিরিয়ে নিই।

বেলুন বলল, আমি তো দাঁড়াতে পারব না বন্ধু। আমি শুধু উড়তেই শিখেছি। আমার শরীরে যতক্ষণ



গ্যাস আছে, ততক্ষণ শুধু উড়তেই থাকব।

তিন বন্ধু ভাবনায় পড়ে গেল। কী করা যায়! বেলুন যদি না থামে! তাহলে তো মহা মুশকিল হয়ে যাবে!

মিতু বলল, তবে ঐ পাহাড়ে চলো বেলুন বন্ধু। সেখানে গিয়ে একটু জিরিয়ে নিই।

বেলুন বলল, ঠিক আছে, তবে তাই চলো।

বেলুন পাহাড়ের দিকে এগিয়ে চলল। কী সুন্দর পাহাড়! ওরা কেউ আগে পাহাড় দেখেনি। কত গাছপালা, ফুল-ফল। কত সুন্দর ঢেউ খেলানো পাহাড়! আনন্দে ওরা নাচতে লাগল। ইতু বলল, এই আস্তে আস্তে, পড়ে যাব তো!

বেলুন এবার চলতে থাকে সাগরের দিকে।

ঐ তো সাগর দেখা যাচ্ছে! সবাই একসাথে চেঁচিয়ে ওঠে।

কী বিশাল সাগর! গাঢ় নীল আর কী স্বচ্ছ পানি! ঢেউয়ের সাথে খেলা করছে ডলফিনের শিশুরা। দূরে ভেসে চলেছে বড়ো বড়ো জাহাজ।

ঘুরে ঘুরে ওরা সাগর দেখলো। সাগর দেখা শেষ হলে নামতে চাইল।

ইতু বলল, বেলুন বন্ধু, এবার থামো। আমাদের নিচে নামিয়ে দাও। আমরা এখন বাড়িতে যাবো। মা বুঝি চিন্তা করছেন।

বেলুন বলল, আমি তো নিচে নামতে পারব না বন্ধু! আমি তো শুধু উড়তেই শিখেছি।

জিতু বলল, তাহলে এখন আমাদের কী হবে!

বেলুন ওদের নিয়ে উড়তেই থাকল।

উড়তে উড়তে আকাশের সাথে মিশে গেল। তারপর তিন বন্ধু আকাশের তারা হয়ে গেল। আকাশের দিকে তাকালে তিন বন্ধুকে দেখতে পাবে। ঐ যে পশ্চিম আকাশের বাম দিকে তাকাও। পেয়েছো! তিন বন্ধু রাত জেগে আলো দেয়। ইতু জিতু আর মিতু। ❑

শিশুসাহিত্যিক

গ্রামের শৈশব

সাদিয়া আলম সিথী

গ্রামের পথে ধুলো উড়ে
খালি পায়ে মনটা দৌড়ে
পুকুর ঘাটে বিকেল বেলা
জলে নেমে হাসির খেলা।

আম কুড়ানো গাছের তলে
রোদ্দুর পড়ে পাতার কোলে
রাতের আকাশ তারায় ভরা
শৈশব তখন স্বপ্ন ধরা।

দাদার গল্প আগুন পাশে
কল্পনা যায় রাজার দেশে
গ্রামের শৈশব সোনালি কথা
ভুলে যায় সব দুঃখ-ব্যথা।

ফিরে দেখা

মো. আমিরুল ইসলাম

শৈশব গেছে পেছন দিকে
আমি গেছি দূর
তবু সে দিন ডাকে আমায়
নীরব এক অচিন মায়াবি সুর।

জীবন শিখিয়েছে অনেক কিছু
দিয়েছে অনেক দায়
শৈশব শিখিয়েছে হাসতে
কাঁদতে মন না চায়।

বড়ো হওয়া মানে অনেক পাওয়া
হারানোও থাকে সাথে
শৈশব ছিল সবচেয়ে বড়ো
পাওয়া না-চাওয়াতে।

ফিরে যাওয়া যায় না আর
তবু মন চলে যায়
শৈশবের স্মৃতি নিয়ে
সারাক্ষণ ঘুরে বেড়ায়।

শৈশবের খেলাধুলা

এস আই সানী

শৈশব মানেই খেলা, দৌড়, হাসি আর মুক্ত আকাশ। শিশুরা খেলার মধ্য দিয়েই শেখে, বেড়ে ওঠে, স্বপ্ন দেখে। খেলাধুলা শুধু সময় কাটানোর মাধ্যম নয়–এটি শিশুর মানসিক বিকাশের, শারীরিক গঠনের এবং সামাজিক শিক্ষার অন্যতম ভিত্তি।

শৈশবের খেলাধুলা মানে মাঠে ছুটে বেড়ানো, কাদায় গড়াগড়ি খাওয়া, ঘেমে ভিজে যাওয়া তবুও মুখে সেই অমলিন হাসি, যা কোনো কৃত্রিম আনন্দে পাওয়া যায় না।









গ্রামীণ খেলাধুলার সোনালি দিনগুলো

বাংলার গ্রামেই যেন শৈশবের খেলাধুলার আসল সৌন্দর্য লুকিয়ে আছে। বিকেল নামলেই শিশুরা মাঠে ছোটে। কেউ লাঠিখেলা খেলে, কেউ গোল্লাছুট, কেউ আবার বউচি বা কানামাছি। মাটির ধুলো ওড়ে, হাসির রোল পড়ে চারিদিক জুড়ে।

বৃষ্টির দিনে আবার আলাদা আনন্দ। তালপাতার নৌকা বানিয়ে পুকুরে ভাসানো কিংবা কাদার মধ্যে দৌড় প্রতিযোগিতা। কোনো পুরস্কার থাকে না, তবুও বিজয়ের আনন্দে মুখ ঝলমল করে। গ্রামের মাঠে শিশুরা শুধু খেলে না, তারা শেখে দলবদ্ধতা, সাহস, মিতব্যয়িতা ও বন্ধুত্বের সত্যিকার মানে।

গ্রামীণ শৈশব-জীবনে কত ধরনের খেলাধুলার যে সমাবেশ ঘটে, তা কি বলে শেষ করা যায়! আবার কী চমৎকার চমৎকার নাম সেসব খেলাধুলার: কাবাডি, এক্কা-দোক্কা বা কিত-কিত, গোল্লাছুট, ডাংগুলি, রাজা-চোর-মন্ত্রী-সিপাহী, মার্বেল বা গুলি, ওপেন টু বাইস্কোপ, কড়িখেলা, লাঠিখেলা, বউচি, টোপাভাতি, চড়ুইভাতি, দাড়িয়াবান্ধা, মোরগ লড়াই, লাটিম, লুডু, ষোলোগুটি, নুনতাখেলা, পুতুলখেলা, ফুল টোকা, বাঘ-ছাগল খেলা, ইচিংবিচিং, কানামাছি, রুমাল চুরি, এলাটিং-বেলাটিং, ঘুড়ি উড়ানো, পানিঝুপ্পা, গোলাপ-টগর, লুকোচুরি, লাট্টু, পিট্টু, কুমিরডাঙ্গা, সাতগুটি, আগডুম বাগডুম ইত্যাদি। এসব খেলার যেমন বাহারি নাম, তেমন অপার আনন্দের।

শহরের শিশুদের খেলার জগৎ

শহরে শৈশবের খেলাধুলা কিছুটা ভিন্ন হলেও আনন্দের রং ছিল এক। ব্যস্ত রাস্তায় কিংবা ছাদে শিশুরা খেলত দড়িলাফ, লুকোচুরি, ক্যারাম বা বোর্ডগেম। স্কুল শেষে ছাদে ঘুড়ি ওড়ানো ছিল এক বিশাল উৎসব।

তবে এখন সেই দৃশ্যও বিরল। বাড়ির ছাদে উঠতে নিষেধ, মাঠে জায়গা নেই–সময়ও নেই। শিশুরা এখন বন্দি হয়ে আছে মোবাইলের পর্দায় আর গেমের কৃত্রিম দুনিয়ায়।

হারিয়ে যাওয়া মাঠ আর নিঃশব্দ শিশুরা

একসময় পাড়ার প্রতিটি মাঠ ছিল শিশুর হাসির কেন্দ্র। আজ সেসব মাঠে গড়ে উঠেছে দালান, দোকান, কিংবা গাড়ির গ্যারেজ। শিশুরা এখন আর দৌড়ায় না, তারা স্ক্রিনে 'রান' বোতাম টেপে দৌড়ায় ভার্চুয়াল চরিত্রে।



এমন বাস্তবতায় শৈশবের খেলাধুলা যেন ক্রমেই হারিয়ে যাচ্ছে। অথচ খেলাধুলা শিশুর জীবনের প্রাণ। খেলাধুলাহীন শৈশব হলো গন্ধহীন ফুল– দেখতে সুন্দর, কিন্তু প্রাণহীন।

খেলাধুলার গুরুত্ব

খেলাধুলা শুধু শরীরকে নয়, মনকেও

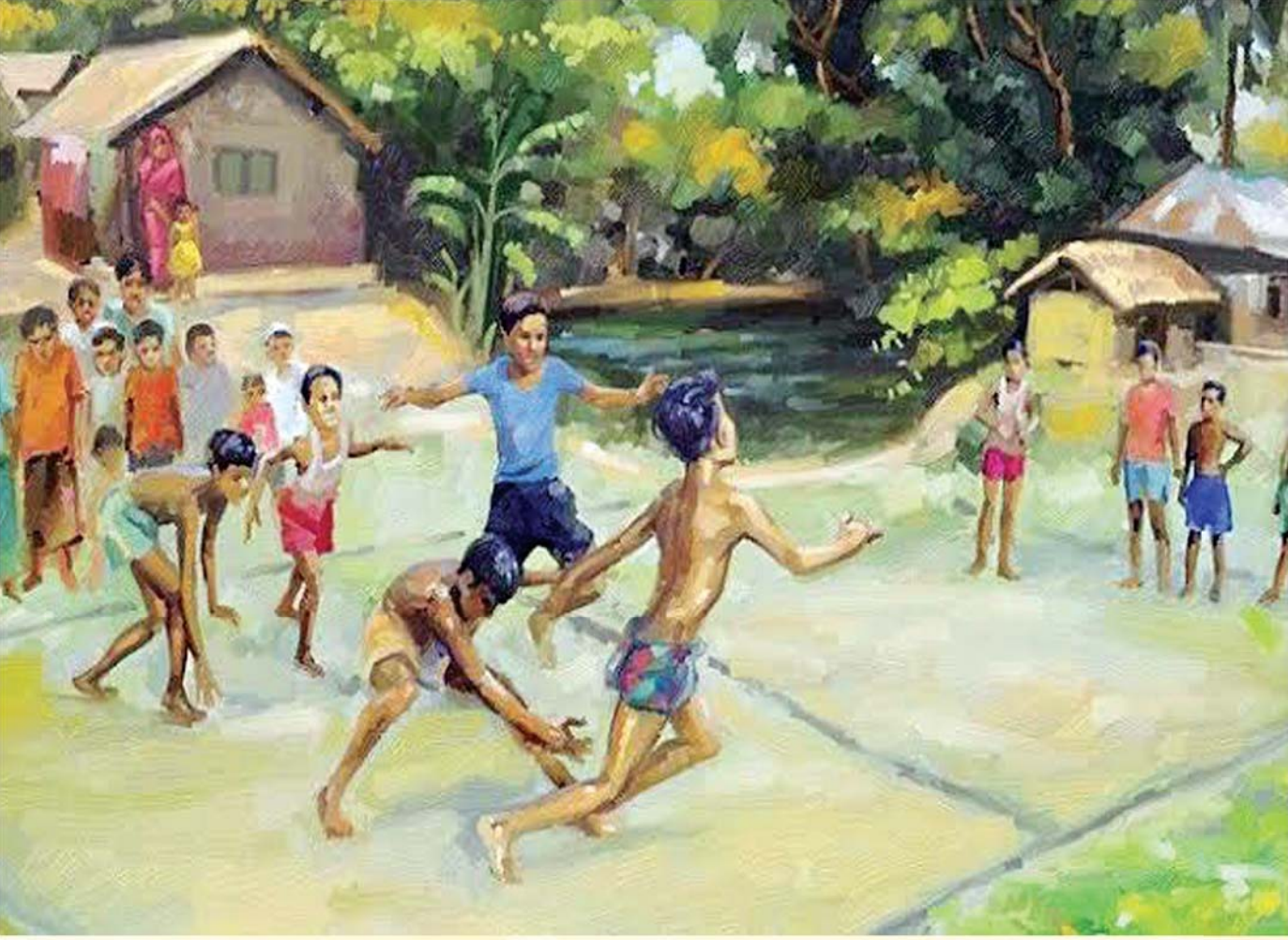

সুস্থ রাখে। এটি শেখায় দলগত সহযোগিতা, আত্মনিয়ন্ত্রণ, পরাজয় মেনে নেওয়ার সাহস। যে শিশু মাঠে হারে, সে ভবিষ্যতের জীবনে জিততে শেখে।

মনোবিজ্ঞানীরাও বলেন, শিশুর সৃজনশীলতা, সাহস, সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা–সবই বিকশিত হয় খেলার মাধ্যমে। তাই খেলাধুলা হলো শিশুর অজান্তেই শেখা জীবনের প্রথম পাঠশালা।

নতুন প্রজন্মের জন্য আমাদের দায়িত্ব

আজকের প্রযুক্তিনির্ভর যুগে শিশুরা যেন প্রকৃতি ও মাঠ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। বাবা-মা এবং সমাজ–দু'জনেরই এখন দায়িত্ব শিশুদের আবার মাঠে ফিরিয়ে আনা। আমাদের উচিত তাদের হাতে মোবাইলের বদলে বল, ব্যাট বা ঘুড়ি তুলে দেওয়া। একটুখানি খোলা আকাশ আর সবুজ মাঠের পরিবেশ-ই পারে শিশুর শৈশবকে আবার প্রাণ ফিরিয়ে দিতে।

শেষ কথা

খেলাধুলা শুধু শৈশবের স্মৃতি নয়, এটি জীবনের স্পন্দন। যে শিশু মাঠে হেসে-খেলে বড়ো হয়, তার চোখে থাকে আত্মবিশ্বাস; তার মনের ভেতর থাকে আলোর রেখা। তাই আসুন, আমরা আবার ফিরিয়ে দিই শিশুদের সেই মুক্ত মাঠ, সেই হাসির হাওয়া, সেই কাদামাখা আনন্দের জগৎ। কারণ, শৈশবের খেলাধুলা মানেই জীবনের প্রথম পাঠ। আর সেই পাঠই মানুষকে শেখায় কীভাবে সত্যিকারের মানুষ হতে হয়। ❑

শিশুসাহিত্যিক

মধুময় বর্ষা

রকিবুল ইসলাম

আমাদের ছোটোবেলার বর্ষা ছিল বৈচিত্র্যময়। এখনকার চেয়ে অনেকটাই ভিন্ন। বর্ষাকাল জুড়ে বৃষ্টি। বৃষ্টি আর বৃষ্টি। একবার শুরু হলে থামতে চাইত না। একনাগাড়ে সাত-আট দিন। বর্ষাকাল শেষ হলেও বৃষ্টি থামত না। ভাবতাম বর্ষা বিদায় নিতে ভুলে গেছে। আশ্বিন মাস পর্যন্ত বর্ষার দাপট থাকত। মা বলতেন, আশ্বিনে গহীন। চারিদিক অন্ধকার করা বৃষ্টি। এ যেন থামতেই চাইত না।

আকাশে কোথা থেকে উড়ে এসেছে একটুকরো মেঘ। বলা নেই, কওয়া নেই ঝুম বৃষ্টি। উঠোনে শুকোতে দেওয়া খড়ি-লাকড়ি কিংবা জামাকাপড় পর্যন্ত তোলার সময় দিত না। আমরা ছোটোরাও খেলতে খেলতে দৌড়ে গিয়ে বারান্দায় দাঁড়াতাম। আমার সঙ্গে আমার প্রতিবেশী বন্ধুরাও তখন আমাদের বারান্দায় থাকত। বৃষ্টি শুরু হলে বারান্দায় শুরু করতাম নতুন কোনো খেলা। শুরু হতো দলবেঁধে নানান খেলার আয়োজন। চারগুটি, বাঘ-বকরি, চোরপুলিশ কিংবা সাপলুডু। কোনো কোনো দিন খেলা হতো কুতকুত। বারান্দায় দাগ টেনে মাটির ভাঙা পাতিলের খোলা দিয়ে কুতকুত খেলতাম।

চারগুটি কিংবা চোরপুলিশ খেলতে মাঝেমধ্যে বড়োরাও অংশ নিতো। ঝুম বৃষ্টিতে ঘরে কোনো কাজ থাকত না। মা-চাচিরা খেজুর পাতার পাটি বুনতেন। কখনও সেলাই করতেন নকশিকাঁথা। নকশিকাঁথায় রঙিন সুতো দিয়ে নানান ডিজাইনের নকশা বানাতেন। নকশিকাঁথা সেলাইয়ের ফাঁকে ফাঁকে চলত আষাঢ়ে গল্প। যেন গল্প দিয়েই সেলাই করতেন এক একটা নকশিকাঁথা।



বর্ষায় খালবিল পানিতে থইথই করত। বাড়ির পাশের পুকুরে পানি ধরত না। উপচে বেরিয়ে যেত নীচু কোনো জমির দিকে। বাড়ির পাশের জমিতেও এক হাঁটু পানি। বড়োরা কেউ কেউ মাছ ধরার জাল, খোলসুন কিংবা ভাইড় চৌকো পাততেন। বাবু ভাই, দুলাল ভাই, রশিদ ভাই, রবিউল ভাই, হাশেম ভাই ও কিরন ভাইকে দেখতাম মাছ ধরতে। আমরা ছোটোরাও থেমে থাকতাম না। ছেড়া জাল কিংবা ভাঙা খোলসুন পেতে আমরাও মাছ ধরতাম। কত রং-বেরঙের মাছ! পুঁটি, খোলসে, দাঁতিনা, কৈ, টাকি। ছেড়া জালেও অনেক মাছ পেতাম। মাছ ধরার উৎসব বাড়ি বাড়ি। সবার বাড়িতে নতুন পানির নতুন মাছ। বাড়ির মা-বোনেরা মাছ কুটতে কুটতে বিরক্ত হয়ে যেত। ঘরে কোনো ফ্রিজ নেই। টাটকা মাছের ঝোল কিংবা চচ্চড়ি খাওয়া যেত। আহ কী স্বাদ!

বাড়ির পাশেই কিলবিল করত বর্ষার পানি। আমরা ছোটোরা কলার গাছ কাটতাম। তারপর বাঁশের কঞ্চি দিয়ে বানাতাম ভেলা। তিন-চারটা কলাগাছ জোড়া দিলেই হয়ে যেত ভেলা। তারপর পানিতে ভাসিয়ে ঘুরে বেড়াতাম দলবেঁধে। বাড়ির পাশে রেললাইনের খাল। সেখানে জমে থাকত এক গলা পানি। সেই পানিতে ভাসাতাম কলার ভেলা। সারাদিন কলার ভেলায় ভেসে বেড়াতাম। সাঁতার কাটতাম। লাফালাফি করতাম। তারপর দিন শেষে ফোলা ফোলা চোখ নিয়ে বাড়ি ফিরতাম। মায়ের বকুনি খেতাম। পরদিন সব ভুলে আবারও ছুটে যেতাম।

বাড়ির পাশে রেললাইনের ওপর বেলতলা মোড়। মোড়ে উঠতেই খাল। খালে বাঁশের সাঁকো। বাঁশের সাঁকোকে আমরা আড় বলতাম। বাঁশের খুঁটির ওপর একটি বাঁশ লম্বা করে শুইয়ে দেওয়া হতো। হাতে ধরার জন্য পাশে থাকত আরেকটি বাঁশ। তারপর উপরের বাঁশ ধরে ধীর পায়ে পার হওয়া লাগত। সাঁকো পাড়ি দিয়ে বেলতলা বাজারে যেতাম। সাঁকো বর্ষায় কোনো কোনো সময় ভেঙে যেত। তখন দুর্ভোগ বেড়ে যেত। কাদা-পানি ভেঙে যাতায়াত করা লাগত।

বর্ষার আগে আগে ফরিদ কাকা খুব ব্যস্ত থাকতেন। মাছ ধরার সরঞ্জাম তৈরি করতেন। তালগাছের বাকল থেকে সূক্ষ্ম আঁশ বের করতেন। তোল্লা বাঁশের সরু কাঠি জোড়া দিয়ে গাঁথতেন খোলসুনের চারাট। তারপর সুন্দর আকৃতি দিতেন। হয়ে যেত মাছ ধরার অতি চমৎকার ফাঁদ।

ফরিদ কাকা রেললাইনের নিচে ছোটো এক খুপরি ঘর তুলতেন। সেখানে থেকেই তিনি মাছ ধরার কাজ সারতেন। অবসরে ভাঙা খোলসুন জোড়াতালি দিতেন। আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার মাছ ধরা দেখতাম। কত রঙের মাছ! কই, পুঁটি, দাতিনা খোলসে! খোলসুন ধরে ওপরে ওঠালেই খলবল করত তাজা দেশি মাছগুলো!

বর্ষায় আরও অনেকেই মাছ ধরত। বিশেষভাবে মনে পড়ে নুর মিয়া ভাইয়ের কথা। নুর মিয়া ভাই, বাবু ভাই, সাদেক ভাই উনারা বিলের বেশি পানিতে মাছ ধরতেন। বড়ো বড়ো ভাইড় পেতে বড়ো বড়ো মাছ শিকার করতেন। মিন্টু মাছ ধরত বেলতলা বাজারের পাশের কালভার্টে। কালভার্টের মুখে মশারি দিয়ে বানানো ঠেলা জাল পেতে রাখত। ঝাঁকে ঝাঁকে গুড়া মাছ পড়ত। আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতাম।

আমাদের বিলের মাঝ বরাবর যে খাল গেছে, সেখানে মাছ ধরার হিড়িক পড়ে যেত। খালের ওপর রেলের ব্রিজ। তার স্রোতে মাছ ধরতে জড়ো হতো দুই গ্রামের অনেক মানুষ। ধর্ম জাল ও তরিয়া জালে ছেয়ে যেত ব্রিজের আশপাশ। খালে পাতা হতো খোরাজাল। এক জালেই পুরো খালের পানি আটকে রাখত। একটু পর পর তোলা হতো খোরাজাল। এক অদ্ভুত জাল বটে। সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ আকৃতির জালের ভূমি অংশ পানিতে ডুবানো থাকত। ভূমির বিপরীতে ছেদ করা বাহুর ছেদ বিন্দুতে জেলে বসে থাকত। তিনি সুযোগ বুঝে সেখানে ভর দিয়ে ছেদ অংশটি নিচের দিকে নামাতেন। ভূমি অংশ আস্তে আস্তে জেগে উঠত। জাল ভেসে উঠলে তাতে টাটকা মাছেরা লাফালাফি করত। কই, পুঁটি, খোলসে, বাইম আরও কত পদের মাছ!

আমাদের বাড়ির পাশের জমির সঙ্গে রেললাইনের খাল। আমরা বলতাম খাদ। বর্ষায় খাদ ভেসে আমাদের জমিতেও হাঁটু পানি। সেই পানিতে আমরা ডাঁটি পেতে মাছ ধরতাম। আমার সঙ্গে থাকত মহিদ, সোহাগ, সোহেল। পাটশলার সঙ্গে সুতো পেঁচিয়ে ডাঁটি বানাতাম। সুতোর মাথায় থাকত মারা কালা। কালায় কেঁচো দিয়ে টোপ গেঁথে দিতাম। তারপর পানিতে ডুবিয়ে রাখতাম। কিছুক্ষণ পর গিয়ে তুললেই পেয়ে যেতাম কই, মাগুর, শিং। মাছগুলো লাফাতো খলবলিয়ে। আমাদের মন নাচত টগবগিয়ে।

বর্ষায় পুকুর-ডোবা কানায় কানায় পূর্ণ। আমাদের বাড়ির পুকুরটি মোটামুটি বড়ো। পুকুরের তিনপাশে আমাদের ও চাচা-জেঠাদের বাড়ি। অন্য দিকটায় বাঁশের ঝাড়। আমরা ভরা পুকুরে যখন তখন নেমে পড়তাম। কলাগাছ বুকের নিচে চেপে ধরে ভেসে বেড়াতাম। আমাদের সঙ্গে বড়োরাও নেমে পড়তেন। নাজমা আপু, লাভলী আপু, মালা আপু, পারভীন আপু, আরজিনা আপু, সাহিদা আপুরা। পুকুর পাড়ে ছিল লম্বা এক তালগাছ। পানিতে তাল পড়ত ঝুপ করে। আমরা কাড়াকাড়ি করে তাল কুড়াতাম। পাকা তাল তখনই কামড়ে খেতাম। পানিতে ভেসে ভেসে তাল খেতাম। আহ কী মজা!

বর্ষা দিনের সবচেয়ে মজা ছিল ঘরে বসে থাকা। চারিদিকে রিমঝিম বৃষ্টি। টিনের চালে ঝমঝম শব্দ। উঠোনে পানির স্রোত। গাছপালা ঝিম মেরে বৃষ্টির খেলা দেখছে। ঘরের বারান্দায় বিড়াল ও কুকুরের খুনসুটি। মুরগিরা ছানাদের বুকের মধ্যে চেপে ধরে ওম দিতে ব্যস্ত। গোয়ালে গরুগুলো থেকে থেকে হাম্বা হাম্বা করে ক্ষিধের সংকেত পাঠাচ্ছে। মাঝে মাঝে জাবর কেটে ক্ষুধা নিবারণের চেষ্টা। দুই-একটা বক কিংবা ফিঙে এদিক-ওদিক উড়ে যাচ্ছে। মা চাল-ডাল ভেজে আনছেন। তারপর পেঁয়াজ, মরিচ ও সরিষার তেলে মাখানো। সবাই জড়ো হয়ে সেই



মাখানো চালভাজা খাওয়া। মাঝেমধ্যে কাঁঠালের কিংবা শিমের বিচি ভাজা। আহা তৃপ্তি!



বর্ষায় গ্রামের কৃষকবাড়িতে তেমন কাজ থাকে না। এ সময় অলস সময় পার করতে হয়। তাই তো বড়োরাও বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সময় কাটাতেন। কেউ দাবা খেলতেন, কেউ লুডু খেলতেন। কেউবা আবার বাড়ির প্রয়োজনীয় জিনিস বানিয়ে সময় পার করতেন। আব্বাকে দেখতাম সুন্দর সুন্দর অনেক ব্যবহার্য জিনিস বানাতেন। বাঁশ-কাঠের এসব জিনিস ঘরে শোভা পেতো। এসবের ফাঁকে চলত রেডিও। রেডিওতে গান ও বিজ্ঞাপন শুনেও বর্ষার অলস সময়ের অনেকটাই কেটে যেত।

বর্ষায় আমাদের বানিয়াকোলা বিল কানায় কানায় পূর্ণ। ফসল বলতে আমন আর আউশ ধান। পানির ভেতর থেকে মাথা বের করে থাকে ধানের শীষ। থইথই পানিতে বিলকে সেসময় সাগর মনে হতো। মানুষেরা নৌকা নিয়ে মাছ ধরত। কেউ কেউ বড়ো আকারের মাটির তৈরি গোলাকৃতির চাড়িতে ভাসত। মাছ ধরত। শাপলা শালুক তুলত। কেউ কেউ হাঁসের জন্য শামুক ঝিনুক কুড়াতো। আমরাও মাঝেমধ্যে মাটির চাড়ি নিয়ে বের হতাম। শাপলা-শালুক তুলতাম। পাকা ঢ্যাপ তুলতাম। শাপলার নল দিয়ে মালা গাঁথতাম। শাপলা ফুলের লকেট গলায় ঝুলে থাকত।

বর্ষায় গ্রামের রাস্তায় হাঁটু পরিমাণ কাদা জমত। এ সময় চলাচল করা বেশ কষ্টসাধ্য। স্যান্ডেল পরে হাঁটা যেত না। খালি পায়ে হাঁটতে হতো। এতে অনেকের পায়েই বর্ষার সময় পাকই লাগত। আঙুলের চিপায় চিপায় পাকই। বৃষ্টির সময় আমরা ছেলেরা ফুটবল খেলতাম। বাড়ির উঠোনে কিংবা বাড়ির বাইরে। ফুটবল বানাতাম বাতাবি লেবু দিয়ে। ঝুম বৃষ্টির মধ্যেই চলত আমাদের ফুটবল গুডবল খেলা। খেলা শেষে ঝাঁপিয়ে পড়তাম পুকুরে। তারপর পুকুরে শুরু হতো আরেক খেলা। আমরা বলতাম বদিখেলা। হাতে হাত বেটে চোর নির্ধারণ করা হতো। তারপর সবাই তাকে ফাঁকি দিয়ে দূরে সরে যেতাম। এভাবে চোর সবাইকে ধরার জন্য ছোটাছুটি করত। কাছে এলেই ডুব দিয়ে হারিয়ে যেতাম। চোরকে সবাই মিলে ক্লান্ত করে ছাড়তাম। এভাবে চোর কাউকে ছুঁয়ে দিলেই সে তখন চোর হয়ে অন্যদের ধরতে চেষ্টা করত। খেলা শেষ করে চোখ দুটো লাল করে বাড়ি ফিরতাম।

এমনি অনেক বৈচিত্র্যময় ছিল আমাদের সময়ের বর্ষা। সারা বছরের ক্লান্তি দূর হতো বর্ষা এলে। বর্ষার প্রকৃতি যেমন সবুজ তেমনি বর্ষা পেলে আমরাও সবুজে সতেজ হয়ে উঠতাম। এখন বর্ষা এলে খুব বেশি মনে পড়ে তখনকার বর্ষার কথা। ফিরে যেতে ইচ্ছে করে ফেলে আসা মধুময় বর্ষায়। ❑

গল্পকার

শিউলি ফুলের দিনগুলো

মীম নোশিন নাওয়াল খান

আমার ছোটোবেলার একটা অংশ কেটেছে নানু বাসায়। কী যে ভীষণ চঞ্চল সুন্দর ছিল সেই দিনগুলো! আজ তোমাদেরকে সেই সময়ের একটা গল্প শোনাই।

আমার নানু বাসা ফরিদপুর শহরে। মফস্বলে বাগানবাড়ি। চারপাশে মূল বাড়ির মাঝে খোলা উঠোন। আর মূল বাড়ির ফটকের বাইরে সবদিকে বাগান। বাগানের চারপাশে আবার উঁচু পাঁচিল। বাগানে কতরকমের ফুল, ফল ও নানারকমের গাছ ছিল! নানুর হাঁস, মুরগি, ছাগল- সব বাগানে ঘুরে বেড়াতো মনের আনন্দে। বুনোফুল তুলে আমি কোঁচড় ভর্তি করতাম প্রতিদিন। লাল-নীল ফড়িং-এর পিছু নিতাম।



এক শরতের ভোরে আমি লেপ মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছি। হয়ত ভোর তখন ছয়টা বাজে। মেজো মামা এসে আমাকে ডাকাডাকি শুরু করল। লেপ থেকে না বেরিয়েও আমি বেশ বুঝতে পারছিলাম বাইরে হিম শীত। আর এই শীতে একবার লেপ থেকে বের হলে লেপের উষ্ণতা চলে যাবে। তখন আবার লেপ মুড়ি দেওয়ার পর দশ মিনিট ঠান্ডায় কাঁপতে হবে যতক্ষণ না আমার গায়ের উষ্ণতায় লেপের ভেতরটা গরম হয়। তাই আমি ঘুমজড়ানো গলায় বললাম, এত ভোরে ডাকছ কেন মেজো মামা? আমি এখন উঠব না।

মেজো মামা বলল, আমি মাত্র ফজর পড়ে মসজিদ থেকে এলাম। আসার সময় একটা দারুণ জিনিস দেখেছি। তোমাকে এটা দেখতেই হবে। শিগগির ওঠো।

মেজো মামা আমার গা থেকে লেপটা টেনে সরিয়ে দিল। সোয়েটার, কানটুপি, মোজা- সব পরিয়ে আবার গায়ে একটা চাদরও জড়িয়ে দিল। তারপর বলল, এখন তাড়াতাড়ি চলো।

বাইরে তখন ঘন কুয়াশায় দুই হাত দূরেও কিছু দেখা যাচ্ছে না। বাগানের বিশাল মেহগনি গাছগুলোকে ধূসর ছায়ার মতো দেখাচ্ছে। গায়ে গরম জামা দিয়েও আমি একটু একটু কাঁপছি।

মেজো মামা আমার হাতে একটা ঝুড়ি ধরিয়ে দিল। তারপর আমাকে নিয়ে গেল বাড়ির মূল ফটকের কাছে। সেখানে ফটক থেকে বাড়ি পর্যন্ত লম্বা পথের দুই পাশে নানারকম ফুল গাছ আর পাতাবাহার গাছের সারি। টগর, গন্ধরাজ, রঙ্গন, শিউলি- কতরকম ফুলের যে গাছ! মেজো মামা আমাকে নিয়ে গেল শিউলি ফুল গাছের কাছে। গিয়ে তো আমার চোখ ছানাবড়া! গাছের নিচে একপাশে বাগানের ঘাসের উপর আর অন্য পাশে মাটির পথের উপর অসংখ্য সাদা ফুল ছড়িয়ে আছে। কী সুন্দর তার ঘ্রাণ! কমলা বোঁটার সাদা ফুল। আমি তো ভীষণ অবাক। কতদিন ধরে আমি এই গাছটায় ফুল ফোটার অপেক্ষায় ছিলাম! এর আগে এক জায়গায় বেড়াতে গিয়ে মা আমাকে শিউলি ফুল দেখিয়েছিল। আমার কী যে ভালো লেগেছিল! সেই থেকে আমি নিয়মিত এসে দেখে যাই এই গাছটায় ফুল ফুটল কিনা। আজকে অবশেষে এত্তগুলো ফুল ফুটেছে!

মেজো মামা বলল, এই দেখো, কত শিউলি পড়ে আছে। এগুলো দিয়ে মালা গাঁথলে খুব সুন্দর দেখায়। নাও নাও, শিগগির কুড়িয়ে নাও!

আমি শীতে কাঁপতে কাঁপতে শিউলি কুড়িয়ে ঝুড়ি ভর্তি করলাম। গাছের ডালে পাতার উপর কিছু ফুল পড়েছিল। মেজো মামা গাছ ঝাঁকি দিতে সেগুলোও টুপটাপ করে নিচে পড়ল। ঝুড়ি ভর্তি শিউলি নিয়ে মেজো মামা আর আমি ঘরে ফিরলাম।

ফিরেই তো আমি প্রচণ্ড উত্তেজনা নিয়ে চিৎকার করে মা, নানু-সবাইকে ডাকাডাকি শুরু করলাম। আমার ফুলগুলো দেখালাম। মা ভ্রু কুঁচকে বলল, ওই গাছটায় তো কখনো ফুল আসে না। কালকেও তো দেখে এলাম- কোনো কুঁড়ি দেখলাম না। এত ফুল কোথা থেকে এল?

মেজো মামা বলল, আপনি হয়ত খেয়াল করেননি বুবু। তাই দেখেননি।

আমি মায়ের কাছে সুঁই-সুতো চাইলাম। মা সুঁইয়ে সুতো পরিয়ে আমাকে শিউলি ফুলের মালা গেঁথে দিল। সেই মালা গলায় দিয়ে আমার সে কী আনন্দ!

সেই যে শুরু হয়েছিল, তখন থেকে আমি যতদিন নানু বাসায় ছিলাম, শরৎ এলেই রোজ ভোরবেলায় শিউলি গাছের তলা সাদা ফুলে বিছিয়ে থাকত। আমি সেই ফুল কুড়িয়ে মালা গাঁথতাম। কিছু ফুল পানিতে ভিজিয়ে সাজিয়ে রাখতাম। কী যে সুন্দর ছিল সেই দিনগুলো!

এরপর আমি ভিকারুননিসা স্কুলে ভর্তি হয়ে আমরা ঢাকায় চলে আসি। শরৎকালে পুজোর ছুটিতে নানু বাসায় গিয়ে সেই শিউলি গাছের তলায় আর কোনো ফুল দেখলাম না। মেজো মামাকে জিজ্ঞেস করাতে

মেজো মামা বলল, তুমি চলে যাওয়ায় গাছটার মন খারাপ হয়েছে তো, তাই ফুল ফোটেনি। তারপর আমাকে সাইকেলের পেছনে তুলে নিয়ে গেল বেশ কয়েক কিলোমিটার দূরে টেকনিক্যাল কলেজে। সেখানে শিউলি গাছের নিচে সাদা ফুল বিছিয়ে আছে- ঠিক আমার নানু বাসার শিউলি গাছের মতো। আমি সেখান থেকে অনেক ফুল কুড়োলাম। মালা গাঁথলাম।

বেশ কয়েক বছর পর এক শরতে নানু বাসায় বেড়াতে গিয়েছি। মেজো মামার সাথে টেকনিক্যাল কলেজ থেকে ফুল কুড়িয়ে এনেছি। মেঝেতে বসে সেই ফুল দিয়ে হাতের ব্রেসলেট গাঁথছি। মা আমার পাশে এসে বসল। বলল, বাহ বেশ সুন্দর হচ্ছে তো ব্রেসলেট!

আমি হাসলাম। মা আমার মাথায় হাত রেখে বলল, আচ্ছা, তুমি কখনো ভেবেছ, যখন তুমি নানু বাসায় থাকতে, নানু বাসার শিউলি গাছটার নিচে ফুল পড়ে থাকত। হঠাৎ তুমি চলে যাওয়ার পর সেটা বন্ধ হয়ে গেল কেন?

আমি কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললাম, মেজো মামা বলেছে আমি চলে গিয়েছি বলে গাছটার মন খারাপ হয়েছে। আমি জানি সেটা সত্যিকারের কারণ না। তবে সত্যিকারের কারণ আমি জিজ্ঞেস করিনি।

মা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে মুচকি হেসে বলল, ওই গাছটায় কখনোই ফুল ফোটেনি। মেজো মামা তোমার জন্য ফজরের নামাজ পড়ে সাইকেল নিয়ে টেকনিক্যাল কলেজের গাছতলা থেকে ফুল কুড়িয়ে এনে ওই গাছটার নিচে ছড়িয়ে রাখত যেন তুমি খুশি হও।

আমি অবাক হয়ে মায়ের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। তারপর আমার হাতে থাকা অর্ধেক গাঁথা শিউলি ফুলের মালাটাকে আলতো করে বুকে চেপে ফিসফিস করে বললাম, থ্যাংক ইউ, মেজো মামা। ❑

শৈশবের দিন

মনোয়ার হোসেন দুলাল

শৈশব মানে রোদ্দুর মাখা সকাল
হাসি আর খেলায় ভরা প্রতিটা বিকাল
শৈশব মানে মায়ের আঁচল
একটুখানি ছুট পেলেই চোখে আসে জল।

শৈশব মানে– বইয়ের পাতায় ছবি আঁকি
কল্পনার ঘোড়া ছুটিয়ে রাখি
শৈশব মানে বৃষ্টি এলে ভিজতে চাই
কাগজের নৌকা ভাসব তাই।

শৈশব মানে অবাক চোখ
অল্পতেই মেটে সব দুঃখ
সেই দিনগুলো ফিরে পেতে
মনটা চায় আবার শৈশবে যেতে।

শৈশবের বন্ধু

রাজিবুল হাসান রাজিব

বন্ধু মানে বিকেল জুড়ে
গল্প আর হাসির ঢেউ
দুষ্টুমিতে সেরা ছিলাম
জানত না তা কেউ।

মার্বেল খেলা আর ডাংগুলি
জিতলেই ছিলাম রাজা
হারলেও কোনো কষ্ট নেই
থাকত শুধু মজা।

বন্ধু মানে শৈশব জুড়ে
হাসি আর আনন্দ
বড়ো হয়েছি, তবু খুঁজি
বন্ধুর গায়ের গন্ধ।

আজ বন্ধুরা সবাই দূরে
সময় দেয় না ডাকে
স্মৃতির পাতায় তারা তবুও
প্রথম সারিতেই থাকে।

গ্রামের দিনগুলো

সানজিদ হোসেন

শৈশব হলো জীবনের সবচেয়ে সুন্দর, নির্মল ও স্মরণীয় সময়। এই সময়ের স্মৃতিগুলো মনে গেঁথে থাকে আজীবন। আর যারা গ্রামে শৈশব কাটিয়েছে, তাদের সেই দিনগুলোর কথা ভাবলেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে সবুজ মাঠ, খোলা আকাশ, নদী, খাল-বিল, পুকুর, গাছগাছালি আর হাসি-খুশি ভরা এক পৃথিবী। গ্রামে কাটানো শৈশবের দিনগুলো এক গভীর অনুভূতি, যা শহরের কোলাহল থেকে আমাদের নিয়ে যায় শিকড়ের কাছে।

গ্রামের সকাল শুরু হতো খুব ভোরে। মোরগের ডাকে ঘুম ভাঙত, সঙ্গে দূরের মসজিদ থেকে ভেসে আসত আজানের ধ্বনি। ঘরের পাশে নারকেল, আম বা কাঁঠাল গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলো ঢুকে পড়ত। মা ভোরে উঠে চুলায় আগুন জ্বালাতেন, ধোঁয়ার গন্ধে পুরো উঠান ভরে যেত। সেইসঙ্গে ছিল পাখির কলকাকলি। শহরের যান্ত্রিক শব্দের বদলে প্রকৃতির এই ডাকেই শুরু হতো আমাদের দিন।

শৈশবের সবচেয়ে আনন্দের অংশ ছিল খেলাধুলা। গ্রামের মাঠ ছিল খেলার জায়গা। স্কুল থেকে ফিরে ব্যাগ ফেলে ছুটে যেতাম মাঠে। কেউ খেলত দাড়িয়াবান্ধা, কেউ কানামাছি, কেউবা গোল্লাছুট। বিকেলে ফুটবল খেলার উত্তেজনা ছিল অন্যরকম। পুরনো বল হলেও আনন্দের কোনো কমতি ছিল না। মাঠে ধুলোমাখা শরীর, ঘামে ভেজা জামা নিয়ে বাড়িতে ফিরে মায়ের বকুনি খেতে হতো।

বর্ষাকালে গ্রামের শৈশব হয়ে উঠত আরও রঙিন। বৃষ্টি নামলেই উঠোনে জমে থাকা পানিতে কাগজের নৌকা ভাসিয়ে দিতাম। কেউ কেউ বৃষ্টিতে ভিজতে দৌড়াতো, কেউবা পুকুরে ঝাঁপ দিত। কাদায় পা

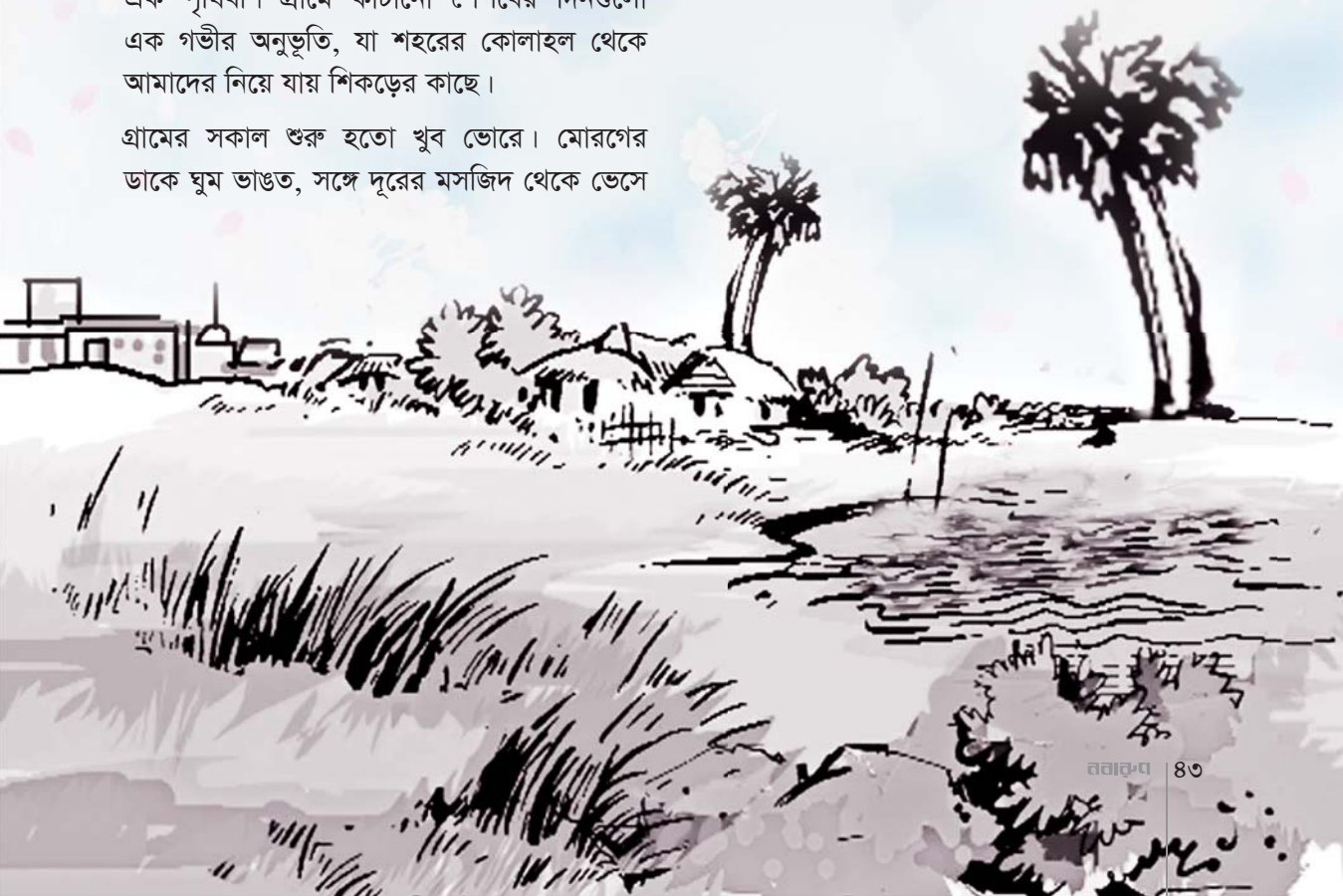

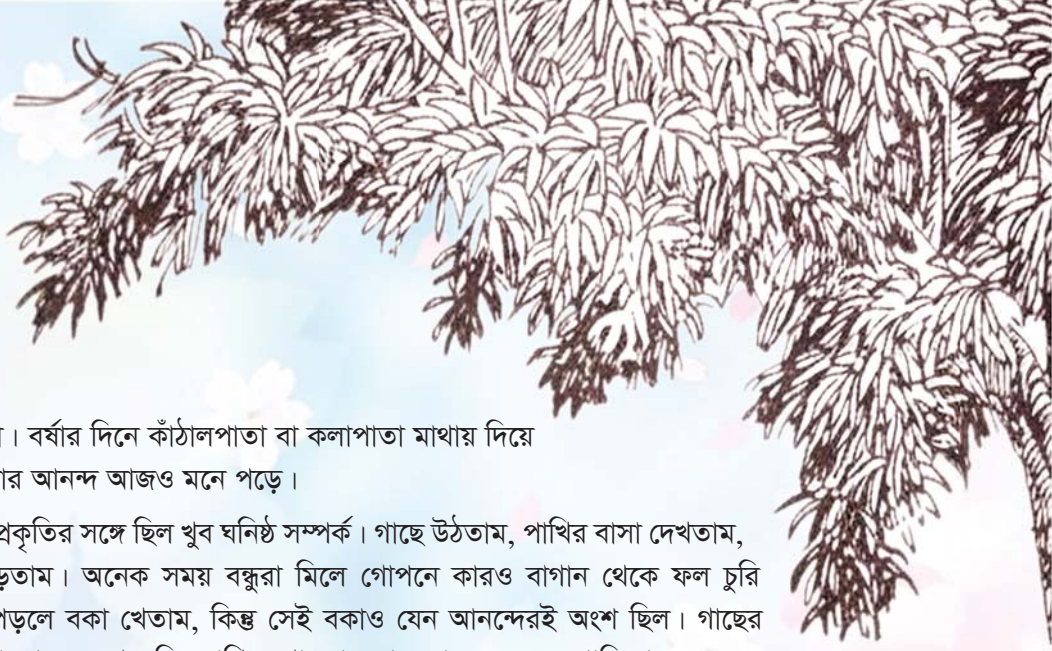

পিছলে পড়ে যাওয়া, তারপর হেসে উঠা–এসব ছিল খুব আনন্দময় ঘটনা। বর্ষার দিনে কাঁঠালপাতা বা কলাপাতা মাথায় দিয়ে বৃষ্টির মধ্যে হাঁটার আনন্দ আজও মনে পড়ে।

গ্রামের শৈশবে প্রকৃতির সঙ্গে ছিল খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। গাছে উঠতাম, পাখির বাসা দেখতাম, আম, জাম পাড়তাম। অনেক সময় বন্ধুরা মিলে গোপনে কারও বাগান থেকে ফল চুরি করতাম, ধরা পড়লে বকা খেতাম, কিন্তু সেই বকাও যেন আনন্দেরই অংশ ছিল। গাছের ডালে বসে কাঁচা আমে লবণ-মরিচ মাখিয়ে খাওয়ার স্বাদ আজও ভুলতে পারি না।

গ্রামের শৈশব মানেই ছিল নদী আর পুকুর। গ্রীষ্মের দুপুরে বন্ধুদের সঙ্গে পুকুরে সাঁতার কাটা ছিল সবচেয়ে বড়ো আনন্দ। কেউ পানিতে লাফ দিত, কেউ ডুব দিয়ে পুকুরের নিচ থেকে কাদা তুলে আনত। শীতকালেও পুকুরে সুযোগ পেলেই নামতাম। শীতের পানিতে শরীর কাঁপলেও মনে হতো এক অন্যরকম সাহসী অভিযানে নেমেছি।

গ্রামের স্কুলজীবনও ছিল খুব সরল ও হৃদয়ছোঁয়া। কাঁচা রাস্তা ধরে হেঁটে বা খালি পায়ে স্কুলে যাওয়া, পথে বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করা–এসব ছিল প্রতিদিনের দৃশ্য। স্কুলের টিফিন মানেই ছিল বাড়ি থেকে আনা মুড়ি, চিড়া, গুড় বা আলুভাজা। সবাই মিলে ভাগাভাগি করে খেতাম। শিক্ষকরা ছিলেন আমাদের অভিভাবক, কঠোর হলেও তাঁদের স্নেহ অনুভব করতাম।

গ্রামের শৈশবে উৎসবের আনন্দ ছিল আলাদা। ঈদ, পূজা, নববর্ষ বা পিঠা উৎসব- সবকিছুতেই ছিল মিলেমিশে আনন্দ করার সুযোগ। শীতকালে নানারকম

পিঠা বানানো হতো। চুলার পাশে বসে গরম ভাপা পিঠা বা পাটিসাপটা খাওয়ার মজা আজও মনে পড়ে। ঈদের দিন নতুন জামা পরে বন্ধুদের সঙ্গে ঘুরে বেড়ানো, সালামি পাওয়ার আনন্দ- এসব স্মৃতি আজও হৃদয়ে উজ্জ্বল।

গ্রামের শৈশবের আরেকটি বড়ো দিক ছিল পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন। সবাই সবাইকে চিনত, সুখে-দুঃখে পাশে থাকত। কোনো বাড়িতে অসুখ হলে পুরো গ্রাম খোঁজ নিত। আমরা বড়োদের কাছ থেকে গল্প শুনতাম- ভূতের গল্প, রাজা-রানীর গল্প, মুক্তিযুদ্ধের গল্প। সেই গল্প শুনতে শুনতে কখন যে রাত গভীর হয়ে যেত, টেরই পেতাম না।

আজকের আধুনিক জীবনে শহরের শিশুদের হাতে মোবাইল, ট্যাব বা কম্পিউটার। কিন্তু গ্রামের শৈশবে আমাদের আনন্দের উপকরণ ছিল খুব সাধারণ- মাঠ, নদী, গাছ আর বন্ধু। প্রযুক্তির অভাব থাকলেও ভালোবাসা আর আনন্দের কোনো অভাব ছিল না। সেই শৈশব আমাদের শিখিয়েছে প্রকৃতিকে ভালোবাসতে, মানুষকে সম্মান করতে এবং অল্পতেই সুখি হতে।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামও বদলে গেছে, বদলে গেছে জীবনধারা। অনেকেই এখন শহরে থাকে, ব্যস্ত জীবনে শৈশবের সেই দিনগুলো শুধু স্মৃতিতেই রয়ে গেছে। কিন্তু যখনই ক্লান্তি আসে, তখনই মনে পড়ে গ্রামের সেই দিনগুলো- খোলা আকাশ, মুক্ত হাসি আর নির্ভেজাল আনন্দ।

সবশেষে বলা যায়, গ্রামে কাটানো শৈশবের দিনগুলো আমাদের জীবনের অমূল্য সম্পদ। এই স্মৃতিগুলোই আমাদের জীবনের কঠিন সময়ে শক্তি জোগায়। যত দূরেই যাই না কেন, গ্রামের সেই শৈশব আমাদের মনে করিয়ে দেয় আমরা কোথা থেকে এসেছি। তাই গ্রামে কাটানো শৈশব শুধু অতীত নয়, এটি আমাদের জীবনের সবচেয়ে সুন্দর অধ্যায়। ❑

গল্পকার

মায়ের কোলে শৈশব

রহমত আলী রুহিত

মায়ের কোলে ঘুমিয়ে থাকা
নিরাপদের নেই কোনো ফাঁকা,
চোখ বুজে ঘুমপাড়ানি সুরে
স্বপ্ন আসে রঙিন হয়ে ঘুরে ঘুরেএ

ভোরের আলো জানালায় পড়ে
মায়ের হাসিতে মন ভরে,
ভাতের গন্ধ দুপুরবেলা
ভালবাসার নরম খেলা।

আঙুল ধরে হাঁটা শেখে
পড়ে গেলে আবারও উঠে,
ব্যথা ভুলে হাসি ফোটে
মায়ের আদর চোখে ভাসে।

শৈশব মানে নিরাপদ ঘর
যেখানে নেই কোনো পর,
সেই কোলে ফিরতে চাই
শিশু মন আজও তাই।





আমাদের শৈশবের ছড়াগুলো

আশিকুর রহমান

শৈশব একটি শব্দ কিন্তু এর ভেতরে লুকিয়ে আছে হাজারো রঙিন স্মৃতি, সরলতা আর নিঃশব্দ আনন্দের গল্প। জীবনের সবচেয়ে নির্ভার সময় শৈশব, যেখানে না ছিল দায়িত্ব, না ছিল দুঃখের ভার। দুরন্তবেলায় রংধনুর সাত রঙে আঁকা ছিল জীবনের ছবি। স্বপ্ন-জাগানিয়া সৃষ্টি সুখের উল্লাসে কাটানো ধুলোমাখা দিনগুলো আজো রঙিন হয়ে ভেসে উঠে স্মৃতির ক্যানভাসে। আমরা হারিয়ে যাই নস্টালজিক দিনগুলোতে। শৈশবকালের নির্দিষ্ট কোনো বয়স পরিসীমা নেই। জন্মের পর থেকে শৈশবকাল শুরু হয় ছন্দময় কথা শুনে শুনে। সেই সময়ের ছড়া শিশুদের কল্পনাশক্তিতে এক মজার জগত তৈরি করে। ধীরে ধীরে শিশু পড়ালেখার জগতে পা দেয়। সেখানেও যুক্ত হয় আরও কিছু মজার মজার ছড়া। নবারুণ বন্ধুদের জন্য এমন কিছু ছড়া তুলে ধরা হলো-

ঘুম পাড়ানি মাসি পিসি
মোদের বাড়ি এসো,
খাট নাই পালং নাই
চোখ পেতে বোসো। [প্রচলিত]

আয় আয় চাঁদ মামা
টিপ দিয়ে যা
চাঁদের কপালে চাঁদ
টিপ দিয়ে যা। [প্রচলিত]

আতা গাছে তোতা পাখি
ডালিম গাছে মউ,
এত ডাকি তবু কথা
কও না কেন বউ? [প্রচলিত]

হাট্টিমা টিম্ টিম্
তারা মাঠে পাড়ে ডিম্!
তাদের খাড়া দুটো শিং,
তারা হাট্টিমা টিম্ টিম্। [প্রচলিত]

বাক্ বাকুম পায়রা
মাথায় দিয়ে টায়রা
বউ সাজবে কাল কি
চড়বে সোনার পালকি। [প্রচলিত]

তাঁতির বাড়ি ব্যাঙের বাসা,
কোলা ব্যাঙের ছা,
খায় দায় গান গায়,
তাই রে-নাই রে না। [প্রচলিত]

আকাশ ঘিরে মেঘ করেছে
সূয্যি গেছে পাটে।
খুকু গেল জল আনতে
পদ্ম দীঘির ঘাটে। [প্রচলিত]

আয়রে আয় টিয়ে
নায়ে ভরা দিয়ে
না' নিয়ে গেল বোয়াল মাছে
তাই না দেখে ভোঁদড় নাচে [প্রচলিত]

খোকা ঘুমালো, পাড়া জুড়ালো.
বর্গি এলো দেশে,
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে
খাজনা দেবো কিসে? (প্রচলিত)



কাজের আনন্দ

মৌমাছি, মৌমাছি
কোথা যাও নাচি নাচি
দাঁড়াও না একবার ভাই।
ওই ফুল ফোটে বনে
যাই মধু আহরণে
দাঁড়াবার সময় তো নাই। [নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য]

আমি হব

আমি হব সকাল বেলার পাখি
সবার আগে কুসম-বাগে
উঠব আমি ডাকি!
সুয্যি মামা জাগার আগে
উঠব আমি জেগে,
হয়নি সকাল, ঘুমো এখন,
মা বলবেন রেগে। [কাজী নজরুল ইসলাম]



হাঁটি হাঁটি পা পা

এক পা যেতে
তিন পা টলে
দুই পা যেতে
ঝুপ।
তিন পা যেতে
এক পা টলে
পাঁচ পা যেতেই
চুপ ! [এখলাস উদ্দিন আহ্‌মদ]

আয় ছেলেরা আয় মেয়েরা

আয় ছেলেরা, আয় মেয়েরা
ফুল তুলিতে যাই,
ফুলের মালা গলায় দিয়ে
মামার বাড়ি যাই। [জসীমউদ্‌দীন]

প্রার্থনা

তুলি দুই হাত করি মোনাজাত
হে রহিম রহমান
কত সুন্দর করিয়া ধরণী
মোদের করেছ দান [সুফিয়া কমাল]

রঙতুলি

রঙতুলিতে ছোপ ছাপ
মাঠের পাশে ঝোপ ঝাপ।
ঝোপের পাশে সোনার গাঁও
একটুখানি বসে যাও। [হাসান জান]

ট্রেন

ঝক ঝকাঝক ট্রেন চলেছে
রাত দুপুরে অই।
ট্রেন চলেছে, ট্রেন চলেছে
ট্রেনের বাড়ি কই? [শামসুর রাহমান]

হাসি

হাসতে নাকি জানে না কেউ
কে বলেছে ভাই?
এই শোন না কত হাসির
খবর বলে যাই। [রোকনুজ্জামান খান]

ঝুমকো জবা

ঝুমকো জবা বনের দুল
উঠল ফুটে বনের ফুল।
সবুজ পাতা ঘোমটা খোলে,
ঝুমকো জবা হাওয়ায় দোলে। [ফররুখ আহমদ]

ছুটি

মেঘের কোলে রোদ হেসেছে,
বাদল গেছে টুটি,
আজ আমাদের ছুটি ও ভাই,
আজ আমাদের ছুটি। [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

মামা ভোলানো ছড়া

আকাশের সূর্যটা যদি তুমি ছুঁতে চাও,
স্বাস্থ্যটা ভাল কর,এক্ষুনি শুতে যাও।
ঘুম যদি ভাল হয় স্বাস্থ্যটা ফুটবে,
সুর্যের সাথে তুমি ঘুম থেকে উঠবে। [নির্মলেন্দু গুণ]

মোদের গরব, মোদের আশা

মোদের গরব, মোদের আশা,
আ মরি বাংলা ভাষা!
তোমার কোলে, তোমার বোলে,
কতই শান্তি ভালবাসা! [অতুল প্রসাদ সেন]

আমাদের গ্রাম

আমাদের ছোট গাঁয়ে ছোট ছোট ঘর,
থাকি সেথা সবে মিলে নাহি কেহ পর।
পাড়ার সকল ছেলে মোরা ভাই ভাই,
এক সাথে খেলি আর পাঠশালে যাই।
[বন্দে আলী মিয়া]

পালকির গান

পালকি চলে!
পালকি চলে!
আগুন জ্বলে!

স্তব্ধ গাঁয়ে
আদুল গায়ে
যাচ্ছে কারা
রৌদ্রে সারা! [সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত]

কাজলা দিদি

বাঁশ বাগানের মাথার উপর
চাঁদ উঠেছে ওই-
মা'গো আমার শোলক-বলা
কাজলা দিদি কই? [যতীন্দ্র মোহন বাগচী]



প্রকৃতির বন্ধু শামুক

ম. জাভেদ ইকবাল

শক্ত খোলসযুক্ত প্যাঁচানো দেহের প্রাণীটিকে দেখলে ছোটো-বড়ো সকলের মধ্যে এক কৌতূহল জন্মে। প্রাণীটি হলো আমাদের অতিপরিচিত শামুক। একে শম্বুক নামেও ডাকা হয়। এদের চলাফেরায় অত্যন্ত ধীরগতি থেকে বাংলা বাগধারায় শম্বুকগতি শব্দটি এসেছে। কারও কাজের গতি খুব কম হলে তাকে শম্বুক বা শামুকের গতি বলে উপহাস করা হয়।

সাধারণত শামুক বলতে স্থলচর, সামুদ্রিক ও স্বাদু জলের শামুককে বোঝায়। মরুভূমি, নদী ও স্রোতস্বিনী, বদ্ধ জলাশয়, জলাশয়, সমুদ্র উপকূলসহ অনেক আবহাওয়াতে এদের দেখা পাওয়া যায়। স্থলচর শামুক বেশিরভাগ মানুষের কাছে পরিচিত হলেও এরা আসলে শামুকের জগতে সংখ্যালঘু। সামুদ্রিক শামুকেরাই বৈচিত্র্য ও সংখ্যায় অনেক বেশি এগিয়ে।

প্রকৃতির জন্য অত্যন্ত উপকারী প্রাণী শামুক। পানি বিশুদ্ধ করা, মাটি উর্বর করা এবং ক্ষতিকর পোকা দমনের মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে শামুক। এরা ময়লাযুক্ত পানি পান করে ও শ্যাওলা খেয়ে পানিকে বিশুদ্ধ রাখে। মরে গেলে তাদের দেহ ও খোলস মাটিতে ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ও পটাশিয়াম সরবরাহ করে, যা মাটিকে উর্বর করে তোলে। এছাড়া, শামুক মাছের অন্যতম খাদ্য হওয়ায় এদের উপস্থিতি মিঠাপানির মাছের সরবরাহ ও বাস্তুতন্ত্রের জন্য অপরিহার্য। এ কারণে শামুককে প্রকৃতির বন্ধু বলা হয়।

কিছু শামুক ধানগাছের ক্ষতিকর পোকা এবং ক্ষতিকারক কীটের খাবার হিসেবে কাজ করে, ফলে কৃষিজ ফসল নষ্ট হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পায়।



শামুক ও এর ডিম কই, শিং, শোল ও কার্প জাতীয় মাছের প্রিয় খাবার। শামুক কমে গেলে মিঠাপানির মাছের খাবার কমে যায়, যার ফলে মাছের সংখ্যাও কমে এবং পানির গুণগত মান নষ্ট হয়। তাই এরা কমে গেলে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হতে পারে। শামুকের শরীরে রয়েছে প্রাকৃতিক জলশোধন ব্যবস্থা বা ফিল্টার। এরা ময়লাযুক্ত পানি পান করে। এতে ময়লা খাদ্য হিসেবে খেয়ে বিশুদ্ধ পানি বাইরে ছেড়ে দেয়। জমিতে প্রচুর শামুক থাকলে ক্ষেতের ফসলও কম নষ্ট হয়। ফলে শামুক কমে গেলে পানি নষ্ট হয়, মাছ মরে যায়। অনেক ক্ষেত্রে পানির রং পরিবর্তন হয়ে ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে যায়। ফলে পানিতে রোগজীবাণু বৃদ্ধি পায়।

গবেষকরা বলেন, যে জমিতে শামুক থাকে, সেখানে উর্বরতা ও ফলন বেশি হয়। অগোচরে কৃষকের বন্ধুর ভূমিকা পালন করে শামুক।

সম্প্রতি শামুক কমে যাওয়ার কারণ অনুসন্ধান নিয়ে এক গবেষণাপত্রে উঠে আসে এসব তথ্য। গবেষণাটি করেন শেখ তানজির আহমেদ ও আসাদুল ইসলাম নামের দুই তরুণ। এটি পরিচালনা করে সাতক্ষীরা বারসিক (বাংলাদেশ রিসোর্স সেন্টার ফর ইনডিজিনাস নলেজ) ইনস্টিটিউট অব অ্যাপ্লাইড স্টাডিজ।

গবেষকরা জানান, দুটি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে গবেষণা করা হয়- প্রকৃতির বন্ধু হিসেবে শামুককে কতটা চেনে মানুষ ও এর বিলুপ্তির কারণ কী।

প্রতিবেদনে বলা হয়, শামুকের উপকারিতা সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই সাতক্ষীরার ১৮ শতাংশ মানুষের। তবে প্রত্যক্ষ ধারণা আছে ৮২ শতাংশের। অর্থাৎ শামুক থেকে উপকার পায় তারা। যেমন- হাঁস-মুরগির খাবার, ঘেরে মাছের খাবার, চুন তৈরিতে ব্যবহার হওয়াতে শামুক বিক্রি করে বা শামুক ভেঙে জীবিকা অর্জনকে বোঝে। আর এই ৮২ ভাগের মধ্যে ৫৮ ভাগ মানুষ পরোক্ষভাবে শামুককে পরিবেশের বন্ধু ভাবেন। এক্ষেত্রে পানি পরিষ্কারক, পানির মিষ্টতা পরীক্ষা, জমির উর্বরতা বৃদ্ধি, রোগের ওষুধ, সাপ ও অন্যান্য প্রাণীর খাদ্য হিসেবে শামুক প্রাকৃতিকভাবে ভূমিকা রাখে বলে মনে করে তারা।

গবেষণাপত্রে বলা হয়, সাতক্ষীরার ৮ শতাংশ মানুষ মনে করে শামুক কমে গেলে কোনো ক্ষতি হয় না। আর ৩ শতাংশ মানুষ ক্ষতি সম্পর্কে জানে না। বাকি ৮৯ শতাংশ মানুষের মতে, শামুক কমে যাওয়ার কারণে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নানা ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। এতে মাছ ও হাঁসের খাদ্য কমে যাওয়া,



পানি নষ্ট হয়ে যাওয়া, মাটির স্বাস্থ্য নষ্ট হওয়া, পানিতে রোগজীবাণু বৃদ্ধি, ইঁদুরের উৎপাত বেড়ে যাওয়া, দেশীয় মাছ কমে যাওয়াসহ পরিবেশের ভারসাম্য বিনষ্ট হওয়ার কথা উল্লেখ করেন তারা।

ঘের মালিকদের চাহিদা অনুযায়ী, শামুক চাষে উৎসাহিত করা, ফসল উৎপাদনে কীটনাশকের ব্যবহার কমানো, প্রজনন মৌসুমে (জুন-আগস্ট) শামুক ধরা নিষিদ্ধ, কেউ যাতে অন্যের জলাশয়ের শামুক ধরতে না পারে সেজন্য সাইনবোর্ড স্থাপন, সরকারের কৃষি বা মৎস্য বিভাগের সাইনবোর্ডগুলোতে শামুকের উপকারিতা তুলে ধরা, সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে প্রশিক্ষণসহ জনসচেতনতা বাড়ানোর

সুপারিশ করা হয় গবেষণাপত্রে। সাতক্ষীরা সরকারি মহিলা কলেজের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের প্রভাষক ওলিউর রহমান বলেন, শামুক দেহ থেকে ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ও পটাশজাতীয় বস্তু মাটিতে ছাড়ে। এরা মরে গেলে মাংস পচে ও খোলায় মাটিতে ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ও পটাশজাতীয় সার তৈরি করে মাটি উর্বর করে।

তিনি জানান, ম্যাচোফেলিয়া ও মাইক্রোফেলিয়া নামের দুটি কীট খেয়ে বেঁচে থাকে শামুক। এই কীট দুটি ধান গাছের ক্ষতিকারক পোকা নষ্ট করতে সহায়তা করে। এতে ফসলের উৎপাদন বাড়ে। পরিবেশের বাস্তুসংস্থান রক্ষায় শামুক ভূমিকা পালন করে। এরা না থাকলে পানির প্রাকৃতিক শোধন ক্ষমতা কমে যায়। এটা নিধনের ফলে কৃষিজমি ও পরিবেশের স্বাভাবিক ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে।

খুলনার বিভাগীয় বন কর্মকর্তা (ডিএফও) জাহিদুল কবির বলেন, ২০১২ সালের ১০ই জুলাই প্রকাশিত সরকারি প্রজ্ঞাপনে শামুককে বন্যপ্রাণী হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন ২০১২-এর ধারা ৬ ও ৩৪-এ বলা হয়েছে, অনুমতি ছাড়া বন্যপ্রাণী শিকার, ওঠানো, উপড়ানো ও ধ্বংস বা সংগ্রহ করা যাবে না।

'শামুক কেনা-বেচা বা আমদানি-রপ্তানি করা যাবে না। এ নিয়ম না মানলে তা অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। এ অপরাধের জন্য এক বছরের কারাদণ্ড ও সর্বোচ্চ ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করার বিধান রয়েছে। তাই শামুক ধরা ও বাজারজাত করা সম্পূর্ণ অবৈধ,' উল্লেখ করেন জাহিদুল কবির।

প্রকৃতির বন্ধু শামুক নির্বিচারে নিধন ঠেকানো প্রয়োজন। প্রয়োজনে ভ্রাম্যমাণ আদালত বসিয়ে শামুক নিধন বন্ধ করতে হবে। প্রকৃতিকে নির্মল আর স্বাস্থ্যবান রাখতে আমাদেরকে শামুক নিধন থেকে বিরত থাকতে হবে। ❑

মহাপরিচালক ফিল্ম আকাইভ, ঢাকা



শিশুরাই আগামী

মো. সোলাইমান হাসান খোকা

শিশু মানেই উজ্জ্বল রোদের হাসি,
ভোরের আকাশ, শিশির ঝরা রাশি রাশি
তাদের নিষ্পাপ চোখে দেশের ভবিষ্যৎ
তারাই হলো আগামীর সবচেয়ে বড় সম্পদ।

শিশুদের কোলাহলে প্রাণ পায় সকাল,
ওদের হাসি হোক অমলিন, নির্ভেজাল।
ভয় নেই মনে, প্রশ্ন ভরা চোখ,
আগামীকে জানার জন্য থাকে উৎসুক।

কলম ধরা হাতে গড়বে তারা দেশ,
সততায় লিখবে নতুন ইতিহাসের শেষ।
ভালোবাসা দিয়ে তাদের রাখতে হবে নিরাপদ,
তবেই হবে সুন্দর এই পৃথিবীর, সুন্দর জনপদ।

বিশ্ব শিশু দিবসে এই হোক প্রার্থনা
শিশুরা যেন না পায় কোনোরকম যাতনা।
প্রতিটি শিশুর জন্য তৈরি হোক যত্নে ভরা আঙিনা।
বিশ্ব শিশু দিবস না হয় যেন সান্ত্বনা।

ধুলোমাখা স্মৃতি

মো. জাহিদ হাসান

আমাদের জীবনের শৈশব একটা রঙিন ঝাঁপি। এটা খুললেই খুঁজে পাওয়া যাবে সুন্দর সুন্দর স্মৃতি, সুন্দর মুহূর্ত, ভালো লাগার কিছু ঘটনা। আমরা প্রত্যেকে আমাদের মনের কোণে খুব সযতনে রেখে দিয়েছি সেই ঝাঁপি। সাদাসিদা ওই জীবন যাপন অনেক সুন্দর ছিল। আজ তোমাদের জন্য আমার শৈশবের কিছু স্মৃতি তুলে ধরলাম–



গল্পছলে গল্প বলে ঘুম পাড়াতো দাদি-নানি



যারা পড়েছিল–
তারা সব আজ কই



প্রথম পাঠ



দোয়াত উলটে কালি গড়ানো প্রহরগুলো
সত্যি বড়ো মধুময় ছিল



লাল রঙের টিনে বাক্সের ভিতর ছিল
অচেনা এক জগৎ



বিদ্যুৎহীন সময়ে হারিকেন-কুপি ছিল আলোর উৎস



পড়ার সাথে মিলে মিশে চলত গল্প আর খেলা



জমে আছে হৃদয়ে– হয়নি মলিন



হলুদ খাম আর কথার ফুলঝুড়িতে
ভরপুর চিঠি আর আসে না



লেইস ফিতার ডাক: এক রঙিন অপেক্ষা



হাওয়াই মিঠাই- মুখে
দিলেই হাসি,
মিষ্টির রাজ্যে সেরা স্বাদ,
আনন্দ রাশি রাশি।



কুলফি মালাই



শনপাপড়ি



সেই হাঁক-ডাক নেই কটকটি অলার

বিশ্ব শিশু দিবস

আইউব সৈয়দ

জাতিসংঘ সনদ অনুযায়ী পৃথিবীর প্রত্যেক মানুষের কতগুলো মৌলিক অধিকার রয়েছে। জাতিসংঘ মানুষের এই মৌলিক অধিকারগুলো রক্ষায় সচেষ্ট। পৃথিবীর জনসংখ্যার এক বিরাট অংশ শিশু। শিশুদের দিকেও জাতিসংঘের দৃষ্টি রয়েছে। শিশুদেরও কতগুলো মৌলিক অধিকার আছে। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে প্রত্যেক শিশু এই অধিকারগুলো ভোগ করবে। শিশুর জরুরি সাহায্য নিয়ে কাজ করার জন্য ইউনিসেফ প্রতিষ্ঠা করে জাতিসংঘ।

জাতিসংঘের ঘোষণা অনুযায়ী, ১৮ বছরের কম বয়সি সবাই শিশু। ১৯৭৯ সালকে ঘোষণা করা হয়েছিল আন্তর্জাতিক শিশু বর্ষ। আর প্রতি বছর অক্টোবর মাসের প্রথম সোমবারকে ঘোষণা করা হয় বিশ্ব শিশু দিবস। বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ বিশ্বব্যাপী শিশুদের অধিকার ও কল্যাণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পালন করা হয়।

বাংলাদেশে শিশু দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য হচ্ছে, 'শিশুর কথা শুনব আজ, শিশুদের জন্য করব কাজ'। ১৯৮৯ সালে জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ (UNCRC) চারটি মূল অধিকার নির্ধারণ করে- বেঁচে থাকার অধিকার, বিকাশের অধিকার, সুরক্ষার অধিকার এবং অংশগ্রহণের অধিকার। এই সনদের ৫৪টি ধারার মধ্যে ৪২টি ধারায় শিশুদের নাগরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, স্বাস্থ্য ও সাংস্কৃতিক অধিকারের নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে এবং বাকি ধারাগুলোতে রাষ্ট্র, জাতিসংঘ, ইউনিসেফ কীভাবে বাস্তবায়ন করবে সে নির্দেশনা দেওয়া রয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি অধিকার হলো– স্নেহ, ভালোবাসা ও সমবেদনা পাওয়া; পুষ্টিকর খাদ্য, চিকিৎসা সুবিধা পাওয়া; শিক্ষার সুযোগ; খেলাধুলা, বিনোদন, অবসরের সুযোগ; নাম ও নাগরিকত্ব পাওয়ার অধিকার; বিশেষ শিশুদের বিশেষ যত্ন; সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের সুযোগ; শান্তি ও বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের মনোভাব নিয়ে গড়ে ওঠার সুযোগ ইত্যাদি। এ সকল অধিকার জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, ভাষা, লিঙ্গ ও ছেলে-মেয়ে নির্বিশেষে রাষ্ট্রের সকল শিশু প্রাপ্য হবে। শিশু অধিকার বিষয়ে জাতিসংঘের এই সনদ শিশুদের জন্য নতুন দিগন্তের দ্বার খুলে দিয়েছে।

শিশুদের মুখে হাসি ফোটানো, তাদের স্বপ্ন ও ভবিষ্যতের জন্য অনুপ্রেরণা জোগানো এবং তাদের জীবনে মর্যাদা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই বিশ্ব শিশু দিবসের প্রধান লক্ষ্য। এ বিশ্ব হয়ে উঠুক শিশুর নিরাপদ আবাসভূমি। অক্ষয় হোক তার মুখের নির্মল হাসি। তাদের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনে, তাদের নিরাপদ বেড়ে ওঠার উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত হবে। বিশ্ব শিশু দিবসে এই আমাদের আন্তরিক প্রত্যাশা।





শূন্যে ভাসা পাখি

মাহমুদা কামাল

আমরা কোনো ভ্রমণে টানা ১০-১৫ ঘণ্টা বিমান বা আরামদায়ক বাসে চড়লেও আমাদের অনেকের কষ্ট হয়। টানা এত ঘণ্টা সিটে বসে থাকা কি চাট্টিখানি কথা? কিন্তু যদি আপনাকে বলা হয়, হাত দুটোকে ডানার মতো ছড়িয়ে টানা ১০ মাস শূন্যে ভেসে থাকতে হবে! কোনো বিশ্রাম নেওয়া যাবে না, মাটিতে পা ফেলা যাবে না!

শুনে নিশ্চয়ই অবাক লাগছে। কারণ মানুষের পক্ষে এটা অসম্ভব হলেও, প্রকৃতির রাজ্যে এমন এক জাদুকর পাখি আছে, যার কাছে এটা কোনো ব্যাপারই না। নাম তার কমন সুইফ্‌ট।

এই পাখিটি টানা ১০ মাস আকাশে ওড়ার ক্ষমতা রাখে। হ্যাঁ, ১০ মাস বা প্রায় ৩০০ দিন! একবারের জন্যও মাটিতে ল্যান্ড করে না!

ওয়েলশ পক্ষীবিদ রোনাল্ড লকলে সেই ১৯৭০ সালেই সন্দেহ করেছিলেন যে, কমন সুইফটরা হয়ত বাতাসের মধ্যেই তাদের জীবনের বেশিরভাগ সময় কাটিয়ে দেয়। কিন্তু তখন তো আর পাখির পিঠে জিপিএস বসানোর প্রযুক্তি ছিল না, তাই প্রমাণ করা যায়নি।

অবশেষে ২০১৬ সালে সুইডেনের লুন্ড ইউনিভার্সিটির একদল গবেষক ঠিক করলেন, এই রহস্যের সমাধান করবেন। তারা ১৩টি পূর্ণবয়স্ক কমন সুইফটের পিঠে একদম ছোটো সাইজের ডেটা লগার বসিয়ে দেন। এতে ছিল অ্যাক্সিলোমিটার এবং লাইট সেন্সর। অ্যাক্সিলোমিটার ওড়ার গতিবিধি মাপে আর তাদের অবস্থান বুঝতে সাহায্য করে।

পাখিগুলো যখন শীতকালে সুইডেন থেকে সাহারা মরুভূমির দক্ষিণে পরিযায়ী হয়ে চলে যায় এবং আবার ফিরে আসে, তখন তাদের পিঠের ওই ছোটো যন্ত্রটি বিজ্ঞানীদের সামনে এক অবিশ্বাস্য সত্য তুলে ধরে।

ডেটা বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানীরা দেখলেন, এই পাখিগুলো বছরে মাত্র দুই মাস মাটিতে থাকে। সেটা শুধুই প্রজনন বা বাচ্চা ফোটানোর সময়। বাকি ১০ মাস এরা আকাশেই থাকে!

গবেষণায় দেখা গেছে, কিছু পাখি মাঝে মাঝে হয়ত কয়েক মুহূর্তের জন্য কোথাও বসেছিল, কিন্তু গড় হিসেবে তারা তাদের সময়ের ৯৯.৫ শতাংশই কাটিয়েছে শূন্যে ভেসে। আর ১৩টি পাখির মধ্যে ৩টি পাখি তো আক্ষরিক অর্থেই টানা ১০ মাস একবারের জন্যও মাটি স্পর্শ করেনি!

এই পাখিগুলো বছরে মাত্র দুই মাস মাটিতে থাকে। ভাবা যায়! মাত্র ৪০ গ্রাম ওজনের একটা ছোট্ট পাখি,

অথচ তার স্ট্যামিনা বা দম যেন অফুরন্ত!

যে পাখিগুলো আকাশে টানা ছিল, তাদের ডানার পালকগুলো ছিল নতুন এবং চকচকে। অর্থাৎ, সেগুলোর ওড়ার দক্ষতা ছিল বেশি। আর যারা মাঝেমধ্যে ল্যান্ড করেছে, তাদের পালক বদলানোর প্রক্রিয়া তখনো শেষ হয়নি। পালক ভালো থাকলে ওড়ার জন্য শক্তি কম খরচ হয়, তাই তারা নামার প্রয়োজনই বোধ করেনি।

গবেষক অ্যান্ডার্স হেজেনস্ট্রম বলেন, 'কমন সুইফটরা ধীরে ধীরে নিজেদের এমনভাবে গড়ে তুলেছে যে, এরা খুব কম শক্তিতে উড়তে পারে। এদের শরীরটা একদম সরু এবং ডানাগুলো লম্বা ও চিকন। ফলে বাতাস কেটে এগোতে তাদের খুব একটা কষ্ট হয় না।'

সবচেয়ে বড়ো যে প্রশ্নটা সবার মাথায় ঘুরপাক খায় তা হলো, তবে কি এই পাখিরা ঘুমায় না? মানুষ যেমন প্লেনে বসে একটু ঝিমিয়ে নেয়, এরাও কি তাই করে?

খাওয়ার ব্যাপারটা এরা আকাশেই উড়ন্ত পোকামাকড় খেয়ে পেট ভরায়। কিন্তু ঘুম? এটা এখনো বিজ্ঞানীদের কাছে এক অমীমাংসিত রহস্য। তবে হেজেনস্ট্রমের ধারণা, এরা সম্ভবত ফ্রিগেট বার্ডের মতো ওড়ার মধ্যেই ঘুমিয়ে নেয়।

ব্যাপারটা হলো পাওয়ার ন্যাপের মতো। প্রতিদিন ভোর এবং গোধূলি বেলায় এই পাখিগুলো প্রায় ২-৩ কিলোমিটার ওপরে উঠে যায়। সেখান থেকে ডানা মেলে নিচে নামার সময় তারা হয়ত কয়েক মিনিটের জন্য ঘুমিয়ে নেয়। ডানা না ঝাপটে বাতাসের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েই তাদের বিশ্রাম হয়ে যায়। ২০১৬ সালে কারেন্ট বায়োলজি জার্নালে এই গবেষণা প্রকাশ করার পর থেকে এই পাখিগুলো এখন আরো জনপ্রিয়। ❑

সূত্র: আইএফএল সায়েন্স

প্রাবন্ধিক

স্কুল ঘণ্টা

মুশফিকুর রহমান

সকাল মানে স্কুলের পথ,
কাঁধে ঝোলা ভার
বন্ধু ডাকে বাঁশির সুরে,
হাসি হতো বারবার।

প্রথম বেঞ্চে স্বপ্ন বসে
শেষ বেঞ্চে দুষ্টু
টিফিন ভাগে অর্ধেক সুখ,
সবাই থাকত হাসি মুখ।

ঘণ্টা বাজে ছুটি মানে,
মুক্ত আকাশ ডানা
মাস্টারমশাই রাগ করলেও
ভয় পেতাম না।

আজও কানে বাজে যেন,
সেই ঘণ্টার সুর।
শৈশব মানে স্কুলঘর,
স্বপ্ন ছিল অনেক দূর।





মিউনিখ ম্যারাথনে লাল-সবুজের পতাকা

জার্মানির মিউনিখে অনুষ্ঠিত জেনারেলি আন্তর্জাতিক ম্যারাথন ২০২৫-এ বাংলাদেশের পতাকা উড়িয়ে দৌড়িয়েছেন প্রখ্যাত ক্রীড়াবিদ শিব শংকর পাল। বিশ্বজুড়ে বিখ্যাত অনেক ম্যারাথনে অংশগ্রহণ করেছেন এই ষাট বছর বয়সি শিব শংকর পাল। এবারের ম্যারাথন মিউনিখ শহরে। এই শহরেরই বাসিন্দা শিব শংকর পাল, তাই এবারের অনুভূতিটা তার কাছে অন্য রকম। এছাড়াও মিউনিখ ম্যারথন প্রতিযোগিতাটা ছিল তার অংশ নেওয়া ২৪তম আন্তর্জাতিক ম্যারাথন।

গত ১২ই অক্টোবর অনুষ্ঠিত মিউনিখ ম্যারাথনে শিব শংকরের মতো প্রায় সাড়ে ২৮ হাজার ক্রীড়াবিদ অংশ নেন। জার্মানির বনেদি শহর মিউনিখের সঙ্গে জড়িয়ে আছে নানা ইতিহাস। আর তাই এই শহরের ম্যারাথনে অংশ নিতে অপেক্ষায় থাকেন পৃথিবীর নানা প্রান্তের ক্রীড়াবিদ। এবারের ম্যারাথনে ৫০টির বেশি দেশের ক্রীড়াবিদ যোগ দেন।

মিউনিখের অলিম্পিয়া পার্ক থেকে স্থানীয় সময় সকাল ৯টায় ম্যারাথন শুরু হয়। নির্দিষ্ট পথে ৪২ কিলোমিটার পেরিয়ে অলিম্পিয়া পার্কেই শেষ হয় দৌড়। ছুটির দিন, মেঘলা আকাশ আর ম্যারাথন- সব মিলে পুরো মিউনিখ হয়ে ওঠে উৎসবমুখর। ম্যারাথন পথের দুই পাশে অসংখ্য মানুষ ক্রীড়াবিদদের অভিনন্দন জানান।

শিব শংকর পাল এক প্রতিবেদককে জানান, এবার সাফল্যের সঙ্গে তার ১৩৮ তম ম্যরাথন শেষ হয়। এর আগে নিউইয়র্ক, হনুলুলু, ভিয়েনা, দুবাই, সিঙ্গাপুর, সাইপ্রাস, বার্লিন, জুরিখসহ বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত ম্যারাথনে অংশ নিয়েছেন তিনি। যেখানেই তিনি ম্যারাথন করেন, সেখানেই শেষ টাচ মার্কের কাছে এসে যত্নের সঙ্গে রাখা বাংলাদেশের লাল-সবুজ পতাকাটি দুই হাতে মেলে ধরেন। বলেন, 'সেই সময় দেশপ্রেমের এক অতুলনীয় অনুভূতি কাজ করে।' ম্যারাথনকে আরও ছন্দময় ও রোমাঞ্চকর করতে অনেক আগে থেকেই শুরু হয়েছে পাহাড়ের ঢাল আর গিরিপথ দিয়ে ম্যারাথন দৌড়। আল্পাইন পর্বতমালার সুইজারল্যান্ড অংশের নয়নাভিরাম ইন্টারলাকেন এলাকায় ইয়ুংফ্রাউসহ আরও দুটি ম্যারাথনে অংশ নিয়েছেন শিব শংকর। তিনি আগামী ডিসেম্বরে মেক্সিকোয় পরবর্তী ম্যারাথনে অংশ নেবেন।

প্রতিযোগীদের স্থানীয় সময় বেলা ৩টা ২০ মিনিটের (৬ ঘণ্টা ২০ মিনিট) মধ্যে দৌড় শেষ করতে বলা হয়েছিল। কিন্তু ষাটোর্ধ তরুণ শিব শংকর ৩ ঘণ্টা ৩২ মিনিটের মধ্যেই তার দৌড় শেষ করেন।

ঢাকার নবাবগঞ্জের ছেলে শিব শংকর পাল তার অনুভুতির কথা প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন, 'প্রিয় জন্মভূমির পতাকা হাতে দৌড়ানো সবসময়ই অনেক গর্বের বিষয়।'

আন্তর্জাতিক ম্যারাথনে আরও অনেক বাংলাদেশি ক্রীড়াবিদ লাল-সবুজের পতাকা উড়িয়ে দেশের গৌরব বৃদ্ধি করবেন এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

প্রতিবেদন: তানিয়া ইয়াসমিন শম্পা

দূরন্তপনা

হাসনাইন আহমদ

চিরল পাতার ফাঁকে ফাঁকে বিরল প্রজাপতি,
আমায় টানে ঘাসের বনে হোক না পাঠে ক্ষতি।

দুই পা ফেলে দুই আঙুলে ফড়িং লেজের পিছে,
হাত বাড়াতেই উড়লো ফুড়ুৎ চেষ্টা মিছে মিছে।

ইরি ধানের বিলে নেমে মাখিয়ে কাদা পায়ে,
সোনা ব্যাঙের পিছু ছুটি সামনে ডানে বায়ে।

সেগুন বনে গাছের থালায় কাঠবিড়ালি হাঁটে,
লুকিয়ে দেখে সেই কাহিনি সারা দুপুর কাটে।

কিশোর বেলার রঙিন স্মৃতি গুলতি, লাটিম, লুডু,
কানামাছি, গোল্লাছুট আর ডাংগুলি হা-ডু-ডু।

কি আজব এক গাছের পাতা, চুপসে গেল টাচে!
কান বাকানো ছাগল ছানা তিড়িংবিড়িং নাচে।

বাজাই বসে মাচার ওপর কলাপাতার বাঁশি,
স্বপ্নে দেখি ঘুড়ি হয়ে নীল আকাশে ভাসি।

এমনি ছিল স্বাধীন জীবন দুরন্ত শৈশবে,
আলফা শিশুর রুদ্ধ জীবন কেমন বলো হবে?

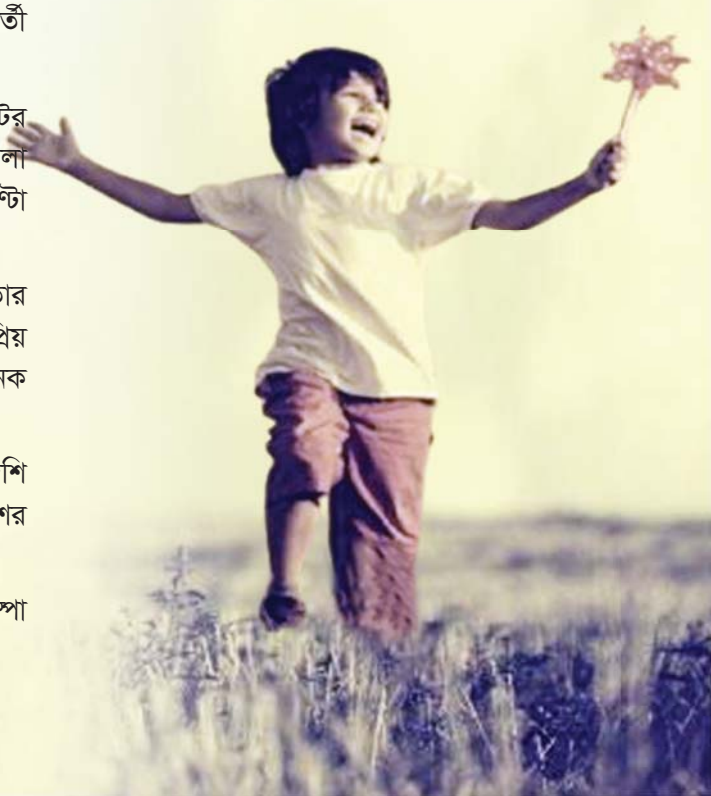



বন্ধু নাকি শত্রু

প্রিয় বন্ধুরা, আমরা প্রতিদিনের খাবারে লবণ ও চিনি ব্যবহার করি। তোমরা কি জানো তোমাদের প্রতিদিনের খাবারে থাকা লবণ আর চিনি তোমাদের বন্ধু আবার শত্রুও হতে পারে? কীভাবে বলো তো? আসলে সবকিছুই নির্ভর করে কতটুকু খাও তার উপর।

লবণ ও চিনিকে বলা হয় সাদা বিষ। কারণ এগুলো অতিরিক্ত পরিমাণে খাদ্য তালিকায় থাকলে স্থূলতা, টাইপ-২ ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ এবং হৃদরোগের মতো দীর্ঘস্থায়ী রোগের ঝুঁকি বাড়ায়। বন্ধুরা, লবণ ও চিনি কিন্তু শরীরের জন্য অপরিহার্য। কিন্তু অতিরিক্ত প্রক্রিয়াজাত সাদা লবণ ও চিনিতে পুষ্টির মান কম এবং এগুলো সরাসরি স্বাস্থ্য সমস্যার কারণ হতে পারে। তাই পরিমিত পরিমাণে সেবন করা জরুরি।

চিনিকে সাদা বিষ কেন বলা হয় জানো? এটি ফাঁকা ক্যালোরি (Empty Calories) সরবরাহ করে যার কোনো পুষ্টিগুণ নেই। এছাড়া চিনির ক্ষতিকর দিকগুলো হচ্ছে এটিতে দাঁতের ক্ষয় হয়, খিদে কমে যায় ও অস্বাস্থ্যকর খাবারের অভ্যাস তৈরি হয়। বেশি চিনি গ্রহণে শিশুদের আচরণগত সমস্যা, অতিরিক্ত চঞ্চলতা এবং মনোযোগে ঘাটতি দেখা দিতে পারে।

চিনি হলো শরীরের দ্রুত শক্তির একটি উৎস। শিশুদের খেলাধুলা ও দৈনন্দিন কাজে তাৎক্ষণিক শক্তি জোগাতে সীমিত মাত্রার চিনি দরকার। কিছু ক্ষেত্রে আবার দুর্বল বা অসুস্থ শিশুদের জন্য অল্প চিনি শক্তি পুনরুদ্ধারে ভূমিকা রাখতে পারে।

চিনি কেন এত মজা লাগে? চিনি খেলে মুখে মিষ্টি লাগে, আবার মনও খুশি হয়। খেলাধুলা করার সময় চিনি একটু শক্তি দেয়। কিন্তু চিনি বেশি খেলে পড়াশোনায় মন বসে না, বারবার শুধু মিষ্টি খেতে ইচ্ছে করে।

আর লবণকে সাদা বিষ বলা হয় কারণ অতিরিক্ত লবণ শরীরকে পানি ধরে রাখতে বাধ্য করে। যা

রক্তচাপ বাড়ায় এবং উচ্চ রক্তচাপের প্রধান কারণ হয়। লবণ আমাদের শরীরের জন্য দরকার। কারণ লবণ শরীরকে শক্ত রাখতে সাহায্য করে। এটি আমাদের পেশি নড়াচড়া করতে এবং শরীরের ভেতরের পানি ঠিক রাখতে সাহায্য করে। পরিমিত পরিমাণে লবণ খেলে শরীর ভালোভাবে কাজ করে। কিন্তু বন্ধুরা সাবধান! তোমরা বেশি লবণ খাবে না। বেশি লবণ খেলে কি হয় জানো? তখন শরীর অসুস্থ হতে পারে। আর বড়ো হলে হার্ট ও কিডনির সমস্যা হতে পারে। বেশি লবণ খেলে স্বাভাবিক খাবারও কিন্তু আর ভালো লাগে না।

বন্ধুরা, লবণ ও চিনি কিন্তু সম্পূর্ণভাবে পরিহারযোগ্য নয়। তবে এর ব্যবহার হতে হবে অত্যন্ত নিয়ন্ত্রিত। তোমাদের বাড়িতে তৈরি করা খাবার, ফলমূল ও প্রাকৃতিক খাদ্যের প্রতি আগ্রহ বাড়াতে হবে। আর অবশ্যই অভিভাবকদের সচেতনতা ও সঠিক খাদ্যাভ্যাসই পারে শিশুদের হোয়াইট পয়জন-এর ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা করতে।

ছোট্ট বন্ধুরা, তোমাদের বলছি- তোমরা ড্রিংকস, চিপস, বিস্কুট, চকলেট, ফাস্টফুড এবং বাইরের খাবার পরিহার করার চেষ্টা করবে। বেশি বেশি ফল, শাকসবজি ও ঘরের তৈরি করা পুষ্টিকর খাবার খাবে। মা-বাবার কথা শুনবে ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থেকে নিরাপদ পানি পান করবে। লবণ ও চিনি পুরোপুরি বাদ দেওয়া নয়, বরং পরিমিত ব্যবহারই সুস্থ থাকার চাবিকাঠি।

প্রতিবেদন: সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

উঠোনের আকাশ

মো. সাজরুল ইসলাম সাজু

উঠোন জুড়ে রোদ্দুর হাসে,
নীল আকাশ ছিল খুব কাছে।
কাগজের নৌকা ভাসিয়ে জলে,
আনন্দে নাচতাম বৃষ্টির তালে।

আজও আকাশ দেখি যখন,
উঠোনটাকেই পাই।
ছোট্ট আমি হাত বাড়িয়ে,
মেঘ ছুঁতে চাই।

শৈশব ছিল খোলা মাঠ,
কোনো দেয়াল নাই।
দূর দিগন্তে যাওয়ার ইচ্ছায়
অনেক শান্তি পাই।

স্মৃতি মাখা শৈশব

মো. মনিরুজ্জামান মনির

স্মৃতি মাখা শৈশব মনে পড়ে খুব,
দলে-দলে নদীতে দিয়েছি ডুব।
আমাদের গ্রামে ছিল দুটো দল,
সবে মিলে খেলেছি প্রিয় ফুটবল।

কাবাডি, কানামাছি, বউ-ছি খেলা,
লেখাপড়ায় ছিল না কোনো অবহেলা।
ছিপ দিয়ে মাছ ধরা খুব ছিল আশা,
পাখপাখালির প্রতি ছিল ভালোবাসা।

স্মৃতির পাতায় আছে সেই সব দিন,
যতদিন বাঁচি যেন থাকে অমলিন।

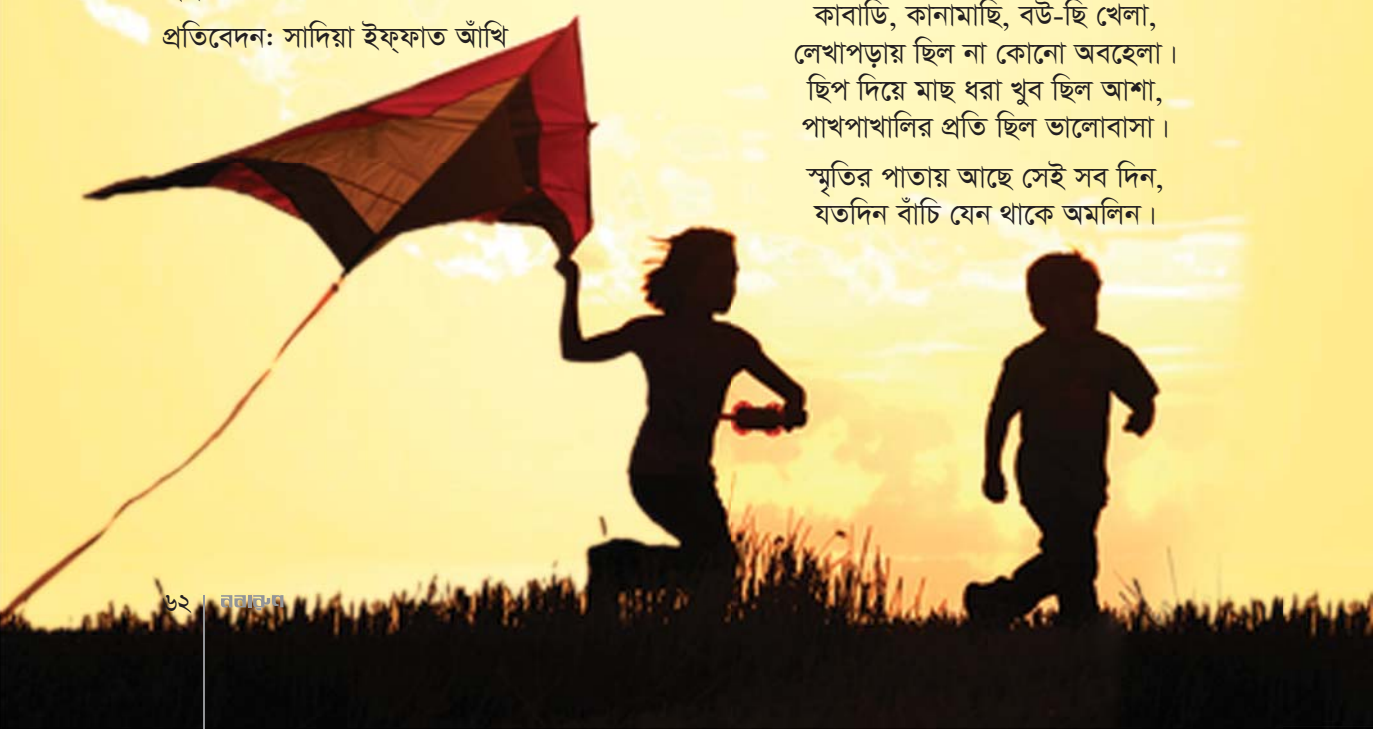



আরিশা হক, তৃতীয় শ্রেণি, আল ইহসান মাদ্রাসা, ঢাকা



ফারিনা আফরোজ, চতুর্থ শ্রেণি, মতিঝিল সরকারি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, ঢাকা



আবিদা সুলতানা, দশম শ্রেণি, বাংলাবাজার সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা



মো: আমিমুল ইহসান বসুনীয়া, সপ্তম শ্রেণি, আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মুগদা, ঢাকা



আমিরা ইসলাম, পঞ্চম শ্রেণি, উত্তরা হাই স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা

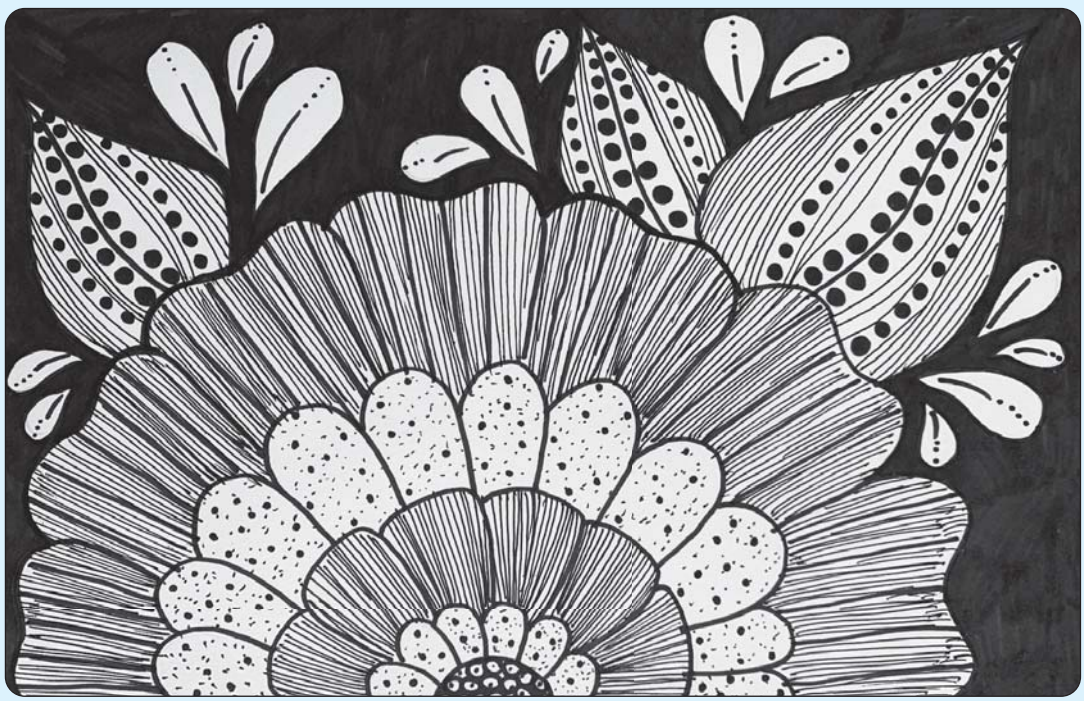

আরিবা তাবাসসুম, দশম শ্রেণি, ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

Regd. Dha. 143, Monthly Nobarun, Vol-50, No-4. October 2025, Tk-20.00
Memorandum No: 15.00.0000.019.05.003.16-211/2022

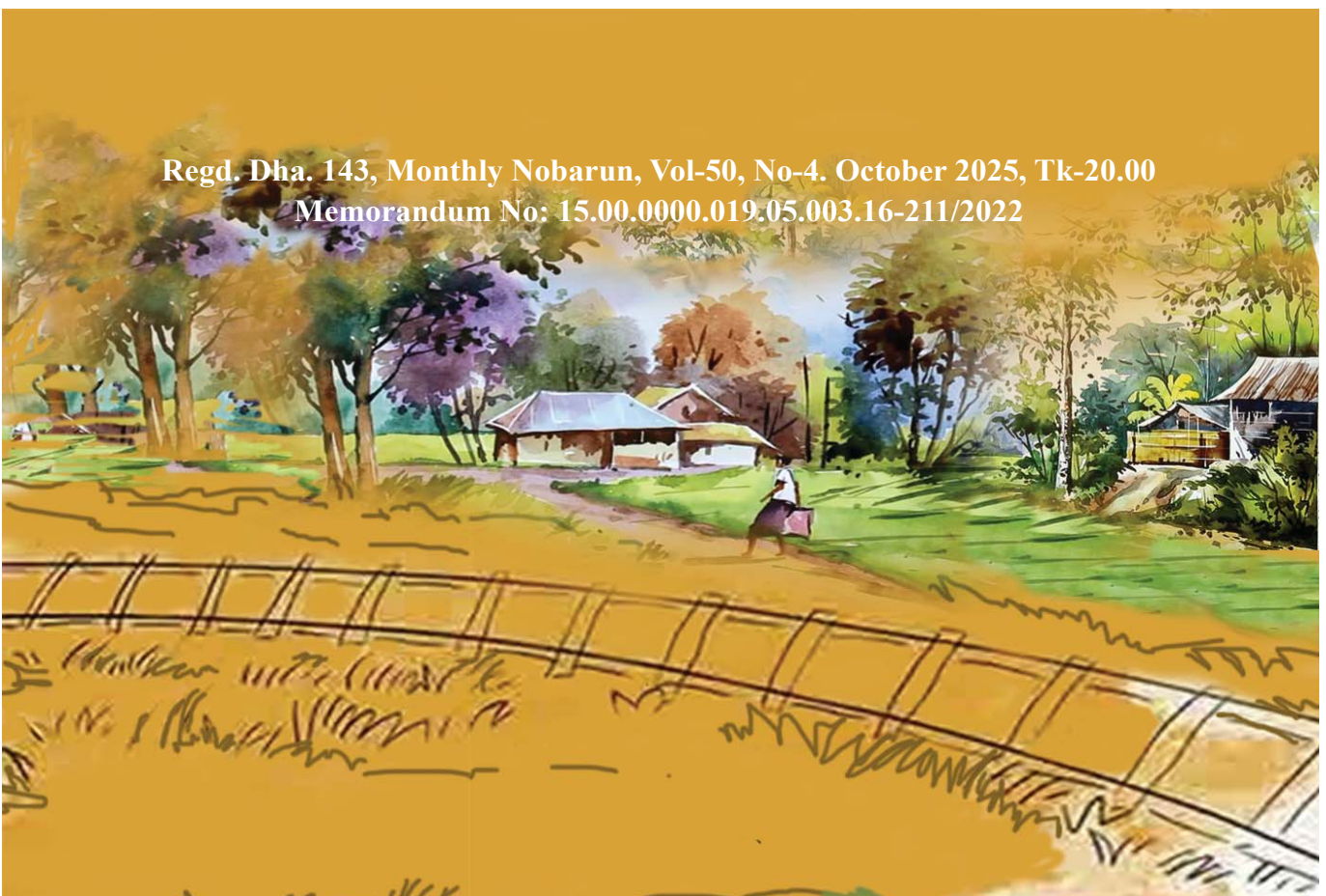



চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা